HISTORY OF EDUCATION IN INDIA

BA [Education]

Third Semester

Paper III

[Bengali Edition]

Directorate of Distance Education

TRIPURA UNIVERSITY

Reviewer

Dr. Taraknath Pan

Professor of Biswabharati University, Santiniketan

Author: Dr. Jayanta Mete

Copyright © Reserved, 2016

Books are developed, printed and published on behalf of **Directorate of Distance Education, Tripura University** by Vikas Publishing House Pvt. Ltd.

All rights reserved. No part of this publication which is material, protected by this copyright notice may not be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form of by any means now known or hereinafter invented, electronic, digital or mechanical, including photocopying, scanning, recording or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the DDE, Tripura University & Publisher.

Information contained in this book has been published by VIKAS® Publishing House Pvt. Ltd. and has been obtained by its Authors from sources believed to be reliable and are correct to the best of their knowledge. However, the Publisher and its Authors shall in no event be liable for any errors, omissions or damages arising out of use of this information and specifically disclaim any implied warranties or merchantability or fitness for any particular use.

Vikas® is the registered trademark of Vikas® Publishing House Pvt. Ltd.

VIKAS® PUBLISHING HOUSE PVT. LTD.
E-28, Sector-8, Noida - 201301 (UP)
Phone: 0120-4078900 • Fax: 0120-4078999
Regd. Office: 7361, Ravindra Mansion, Ram Nagar, New Delhi – 110 055
• Website: www.vikaspublishing.com • Email: helpline@vikaspublishing.com

সিলেবাস বই - ম্যাপিং টেবিল

সিলেবাস	বই - ম্যাপিং
প্রথম একক	**(পৃষ্ঠা 1 - 36)**
১. বৈদিক শিক্ষা	
২. ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থা	
৩. বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা	
৪. মুসলিম শিক্ষা	
দ্বিতীয় একক	**(পৃষ্ঠা 37 - 78)**
১. শ্রীরামপুর কলেজ ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কার্যাবলী	
২. ঐতিহাসিক মেকলে মিনিট এবং সনদ আইন	
৩. বাংলার নবজাগরণ	
তৃতীয় একক	**(পৃষ্ঠা 79 - 98)**
১.হান্টার কমিশন	
২. কার্জনের শিক্ষা সংস্কার	
৩. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বা স্যাডলার কমিশন (১৯১৭)	
চতুর্থ একক	**(পৃষ্ঠা 99 - 143)**
১. রাধাকৃষ্ণন কমিশন	
২. মুদালিয়র কমিশন	
৩. কোঠারী কমিশন	

সূচীপত্র

প্রথম একক **(পৃষ্ঠা 1 - 36)**

১. বৈদিক শিক্ষা

২. ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থা

৩. বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা

৪. মুসলিম শিক্ষা

দ্বিতীয় একক **(পৃষ্ঠা 37 - 78)**

১. শ্রীরামপুর কলেজ ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কার্যাবলী

২. ঐতিহাসিক মেকলে মিনিট এবং সনদ আইন

৩. বাংলার নবজাগরণ

তৃতীয় একক **(পৃষ্ঠা 79 - 98)**

১.হান্টার কমিশন

২. কার্জনের শিক্ষা সংস্কার

৩. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বা স্যাডলার কমিশন (১৯১৭)

চতুর্থ একক **(পৃষ্ঠা 99 - 143)**

১. রাধাকৃষ্ণন কমিশন

২. মুদালিয়র কমিশন

৩. কোঠারী কমিশন

টিপ্পনী

ভূমিকা

টিপ্পনী

'শিক্ষা' হল আধুনিক কালের মানব জীবনে সংযোজিত বিষয় গুলির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়। ব্যাক্তি তথা সমাজের উন্নয়ন যে বিষয়ের উপর নির্ভর তা আর অন্যকিছু না শুধুমাত্র শিক্ষা, বিজ্ঞান এই শিক্ষা বিজ্ঞানের গোড়ার কথা জানতে হলে আমাদের ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রয়োজন। তাই এই "ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস" বইটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভারতীয় শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে অবগত করবে। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্মানিক স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য নির্ধারিত 'ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস' বইটি লেখা হল। ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস সম্বন্ধে বাংলায় লিখিত একাধিক পুস্তক থাকলেও আশা রাখি, সুধীবৃন্দের কাছে বর্তমান গ্রন্থটি বাহুল্যরূপে বিবেচিত হবে না। ছাত্র ছাত্রীদের এবং ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহী সাধারণ পাঠকবৃন্দের কথা মনে রেখেই ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসের জটিল তত্ত্বসমূহ তাদের মান অক্ষুন্ন রেখে যথা সম্ভব সহজ ও মনোগ্রাহি রূপে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছি।

গ্রন্থটি পাঠ করে শিক্ষার্থী, ছাত্র- ছাত্রী ও ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস সম্বন্ধে উৎসাহী পাঠক কিছুমাত্র উপকৃতহলে,আমার শ্রম সার্থক হবে।

গ্রন্থটি প্রকাশনায় "বিকাশ পাবলিশিং হাউস" - এর সদিচ্ছা ও সহযোগিতার জন্য তাঁদের প্রত্যেকেই জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

প্রথম একক

বৈদিক শিক্ষা

টিপ্পনী

সূচনা

ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে মোটামুটি ৩টি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন যুগে ভারতের শিক্ষা, মধ্যযুগে ভারতের শিক্ষা এবং আধুনিক যুগে ভারতের শিক্ষা। ইতিহাস অখন্ডও অবিভাজ্য। শিক্ষার ইতিহাস ও তাই। আধুনিক ভারতে যে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তার উৎস তবু খুঁজতে হবে প্রাচীন ভারতেই।

ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসকে আমরা আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য সাধারনত তিনটি যুগে ভাগ করি। কেউ কেউ শিক্ষার ইতিহাসকে হিন্দু যুগ, মুসলমান যুগ এবং আধুনিক যুগ হিসাবে ভাগ করেন। এরূপে ভাগ করা ঠিক নয়। কারণ হিন্দুযুগে কেবলমাত্র হিন্দু শিক্ষাই প্রচলিত ছিল না, বৌদ্ধ ও ভারতের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে ও শিক্ষা প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধ শিক্ষা ও এক সময়ে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাকে ম্লান করে দিয়েছিল। তেমনি মুসলমান যুগে কেবলমাত্র মুসলমানী শিক্ষাই প্রচলিত ছিল না, হিন্দু শিক্ষাও প্রচলিত শিক্ষা ছিল। ব্রিটিশ যুগেও তেমনি কেবলমাত্র ইংরেজী শিক্ষাই একমাত্র শিক্ষা ছিল না, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে দেশীয় শিক্ষা ও প্রচলিত ছিল। অতএব, হিন্দু শিক্ষা, মুসলমান শিক্ষা এবং ইংরেজী শিক্ষা এইভাবে ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসকে ভাগ না করাই বাঞ্চনীয়। এরূপ ভাগ করলে শিক্ষার ইতিহাসকে বিকৃতই করা হবে।

বৈদিক শিক্ষার লক্ষ্য

প্রাচীন কাল থেকেই ভারতের সভ্যতা সমন্বয় ধর্মী আর্য ঋষি নিজেকে ক্ষুদ্রগন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না রেখে বিশ্বমানবকে বলেছেন - "অমৃতস্য পুত্রাঃ"। এই উপলব্ধি থেকেই সমন্বয়ের মনোভাবের জন্ম নিয়েছিল। প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধর্মকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। আর্য ঋষিরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, পরমাত্মা অবিনশ্বর হলেও জীবাত্মা নশ্বর। তখন শিক্ষা ধর্মের সঙ্গে গভীর ভাবে যুক্ত ছিল। আর্য ঋষিরা মনে করতেন যে, আত্ম-জ্ঞান ও আত্মপলব্ধি - ই হচ্ছে শিক্ষার চরম লক্ষ্য। 'আত্মনাং বিদ্ধি' নিজেকে জানবার মধ্য দিয়েই সত্যোপলব্ধির সাধনা আর্য ঋষিরা করে গিয়েছেন। হিন্দু দর্শন ও ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার মতে, শিক্ষার লক্ষ্য হল আত্মোপলব্ধি (Self realization)ও আত্মবিকাশ (Self - developnet)। জ্ঞানার্জনের শেষ নেই। শিক্ষার শেষ নেই - "যাবজ্জীবন অধীতে বিপ্রঃ।" পরম

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
1

ব্রহ্মকে জানবার অতীন্দ্রীয় বাসনা থেকেই ভারতীয় আর্য ঋষিরা একসময় বলেছিলেন - "ভূমৈব সুখ্যং, নাল্পে সুখমস্তি।" বিদ্যাই মানুষকে মুক্তির সন্ধান দেয়। " সা বিদ্যা যা বিমুক্ত যে।" আর্য ঋষিরা জাগতিক সুখকে জীবনের চরম বলে মনে করেন নি - "যেনাহং নামৃতাস্যাম কিমহং তেন কুর্বম।" জ্ঞান অর্জন করবার পরিবর্তে চরিত্র গঠন ব্যাক্তিত্ব বিকাশ ও আত্মোপলব্ধি ছিল প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার আদর্শ ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার শেষ কথা ছিল আত্মার মুক্তি। পরাবিদ্যা ও অপারিদ্যার মধ্য দিয়েই ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা বিকশিত হয়েছিল। ব্রহ্মবিদ্যা বা অধ্যাত্ম বিদ্যা-ই- পরবিদ্যা ; আর যাবতীয় শিল্প - বিজ্ঞান - কলা ইত্যাদি লৌকিক বিদ্যা হল অপরাবিদ্যা। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা চেয়েছিল দুই ধরনের শিক্ষার যুগপৎ বিকাশ ঘটাতে। পরাবিদ্যা শিক্ষার শেষ কথা হলেও অপরাবিদ্যা ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছিল।

টিপ্পনী

বিদ্যারম্ভ, ব্রহ্মচর্য ও আচার্য

বর্তমান যুগে 'হাতে খড়ি' অনুষ্ঠানের মত তখন নবীন শিক্ষার্থীর প্রাথমিক শিক্ষা 'বিদ্যারম্ভ' ও 'অক্ষর স্বীকরণ' নামক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হল। পাঁচ বছর বয়সে চৌল কর্ম ও চূড়াকর্মের মধ্য দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা হত। প্রাথমিক শিক্ষা পরিবারের মধ্যে পিতার তত্ত্বাবোধনে - ই - সম্ভব হত। পিতা-ই পুত্রকে বেদ শিক্ষা দিতেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ শিক্ষার্থীরা যথাক্রমে ৮, ১১, ও ১২ বছর বয়স পর্যন্ত পিতার শিক্ষা গ্রহণ করত। শূদ্রের বেদ শিক্ষা অধিকার ছিল না। পরে শিক্ষা জটিল হলে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন গুরুকূল ও আচার্য সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। ভারতের তপোবণ হচ্ছে আদি বিদ্যালয় ও আর্য ঋষিরা হচ্ছেন আদি গুরুকূল। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থার তপোবণের গুরুই (আশ্রম) ছিল শিক্ষার্থীর পূর্ণতীর্থ। উপনয়ন ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থার একটি প্রাচীন সংস্কার উপনয়নের অর্থ হচ্ছে - সমীপে নিয়ে যাওয়া। পিতার কাছে প্রাথমিক শিক্ষার পর উপনয়নের মধ্যে দিয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করে শিক্ষার্থীরা গুরুগৃহে গমণ করত। ব্রাহ্মন, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের যথাক্রমে ৮, ১১ ও ১২ বছর বয়সে উপনয়ন হত। পরে এই বয়সকাল আরো বেড়ে যায়। গুরুগৃহে - ই থাকতে হত। শিক্ষার্থীকে নানাভাবে পরীক্ষা করে উপযুক্ত বিবেচিত হলে তবেই গুরু তাকে শিক্ষা দিতেন। প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা তাই ব্রহ্মচর্যাশ্রম বলে খ্যাত। প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরু বা আচার্য ছিলেন পরম শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি শিক্ষার্থীদের পারমার্থিক পিতা হিসাবে সম্মান পেতেন। সে যুগে গুরুর সাহায্য ছাড়া বেদশিক্ষা সম্ভব ছিল না। আচার্য ছিলেন ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি পক্ষপাত শূন্য সমদৃষ্টি নিয়ে আচার্য সমস্ত বিদ্যা শিক্ষাদান করতেন। আচার্যের শিক্ষাদানকে জীবনের মহত্তম বৃত্তি বলে মনে করতেন। ত্যাগ চরিত্র, জ্ঞান ও ধর্মে ঐকান্তিকতার জন্য সমাজে আচার্য সর্বাধিক পূজ্য ছিলেন। শিক্ষায় গুরু- শিষ্যের মধুর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গুর-শিষ্যকে সর্বাধিক কর্মই উপদেশ দিতেন গুরুগৃহে শিষ্য সেই পরিবারের একজন হয়েই বসবাস করত। গুরুই শিষ্যের আহারের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। আর্থিক

স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে গুরু শিক্ষাদান করতেন। পারিশ্রমিক ছাড়াই তিনি বিদ্যাদান করবেন।

আশ্রমের বৈদিক শিক্ষা

প্রাচীন ভারতে গুরুগৃহ বা আশ্রমকে কেন্দ্র করেই ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থার এই আশ্রমিক রূপের মধ্যে ব্যাক্তি কেন্দ্রীক শিক্ষা - ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল আশ্রমে শিক্ষার্থীরা গুরুর সান্নিধ্যে থেকে তাঁর উন্নত চিন্তাধারায় নিজেদের সমৃদ্ধ করত। শিষ্যকে গুরুগৃহে অনেক রকম কাজকর্ম করতে হত। গোপালন, ভিক্ষা সংগ্রহ, গৃহের কাজকর্ম ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কর্মকেন্দ্রীক শিক্ষা লাভ করত। ফলে, স্বাবলম্বন, কর্মক্ষমতা, শ্রমের মর্যাদা মনুষ্যত্ববোধ, আত্মত্যাগ, সেবামূলক মনোভাব ইত্যাদি গুণাবলী শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিকশীত হত। আশ্রমের পরিবেশ শিক্ষার্থীদের আত্মবিকাশের অনুকূল ছিল। গৃহ পরিবেশ থেকে দূরে, প্রকৃতির নির্জণ পরিবেশে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণ করত। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার আশ্রমিক ব্যবস্থা ছিল অবৈতনিক। শিক্ষা গ্রহনের পর শিক্ষার্থীরা তাদের সাধ্যানুসারে গুরুদক্ষিণা দিত। শিক্ষার্থীরা ভিক্ষা করে আশ্রমের খরচ চালাতেন। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে শিক্ষার্থীদের ভিক্ষা দিতেন।

বৈদিক শিক্ষার পাঠক্রম

বৈদিক শিক্ষায় ব্যাপক পাঠক্রম ছিল না। পরে পাঠক্রমের মধ্যে নানাবিধ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ব্রাহ্মণ্য যুগে বর্ণভেদে শিক্ষার তারতম্য সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন বর্ণের উপযোগী বৃত্তি শিক্ষা পাঠক্রমে স্থান পায়। ৪টি বেদ (ঋক, সাম, যজু,অথর্ব), ৬টি বেদাঙ্গ (ছন্দ,ব্যাকরণ, শিক্ষা অর্থাৎ ধ্বনিবিজ্ঞান, নিরুক্ত, কল্প ও জ্যোতিষশাত্র), উনিষদ, আরণ্যক ও ব্রাহ্মণ পাঠক্রমের অন্তগৃত ছিল। ব্রাহ্মণদের আচরণবিধি পালনের জন্য সূত্র ও দার্শনিক জ্ঞানের জন্য বেদান্ত ও পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। পাঠক্রমের মধ্যে ইতিহাস, পুরাণ, ব্যকরণ, অস্ত্রবিদ্যা, রাশি (গণিত), ভূতবিদ্যা, সর্পবিদ্যা, নক্ষত্র বিদ্যা, একায়ন (নীতিশাস্ত্র), ব্রহ্মবিদ্যা, বাক্যাবাক্য(তর্কশাস্ত) ইত্যাদি বিষয়ও স্থান পেয়েছিল।

শিক্ষাদান পদ্ধতি

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষায় মৌখিক পদ্ধতি সর্বাধিক স্থান পেয়েছিল। তবে গুরু অনেক সময় শিষ্যের সঙ্গে আলোচনা করে শিক্ষাদান করতেন। বেদ শিক্ষাগ্রহণে অনেক সময় লাগত। সাধারণত শ্রাবণ পূর্ণিমাতে শিক্ষারম্ভ হত। অমাবস্যা - পূর্ণিমা, ঝড়-বৃষ্টি, ধর্মানুষ্ঠান প্রভৃতি কারণে শিক্ষাদান বন্ধ থাকত। গুরু-শিষ্যের মধ্যে মধুর সম্পর্ক থাকলে ও শিক্ষার শাস্তিদানের ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষার্থীদের ভয় দেখিয়ে, খেতে না দিয়ে, ঠান্ডা জলে স্নান করতে দিয়ে শাস্তি দেওয়া হত, - দৈহিক শাস্তিদানের ব্যবস্থা ছিল না।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

চরম অবস্থার মধ্যে গুরুগৃহ থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হত। প্রতি বছর ৪ ১/২ থেকে ৬ মাস শিক্ষাদান চলত - পরে এই সময় বাড়িয়ে দেওয়া হয়। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষায় ব্যাক্তি কেন্দ্রিক শিক্ষার প্রাধান্য থাকলেও গুরু সমষ্টিগত শিক্ষা ও দিতেন। গুরুর মৌখিক শিক্ষা থেকে শিক্ষার্থীরা আবৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করত । গুরু মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে যুক্তি ও বিচার স্থান পেত। গুরু ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন বিষয় বুঝিয়ে দিতেন । শিক্ষা পদ্ধতিতে স্মৃতি ও মেধাশক্তির বিশেষ গুরুত্ব ছিল। শ্রবণ-মনন- নিদিধ্যাসনের মাধ্যমে শিক্ষাদান হত।

শ্রবণ : গুরু যা বলেন তা মন দিয়ে শোনা।

মনন : গভীর ভাবে চিন্তা করা।

নিদিধ্যাসন : একাগ্র ভাবে ধ্যান করে সত্যকে উপলব্ধি করা।

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা যুক্তি নির্ভর হওয়ায় শিক্ষার প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। অনেক সময় গুরু সম্বধনে শিক্ষা দিতেন। শিক্ষায় পরীক্ষা ব্যবস্থা না থাকলেও বিতর্ক ও আলোচনায় অংশগ্রহণ থেকে শিক্ষার্থীদের অধীত বিদ্যার পরীক্ষা হত। সমাবর্তন উৎসবের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থী তার শিক্ষা সম্পূর্ণ করে গুরুগৃহ থেকে বিদায় নিত। গুরু সমাবর্তন উৎসবে শিক্ষার্থীকে কতকগুলি মূল্যবান উপদেশ দিতেন - সেই উপদেশ গুলি ও অধীত বিদ্যাকে সঙ্গে নিয়ে শিক্ষার্থী বৃহত্তর জীবনের কর্মযজ্ঞে প্রবেশ করত।

শিক্ষার্থীদের আচরণ বিধি

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের কঠোর আচরণ বিধি মেনে চলতে হত। কঠোর বিধিনিষেধ ও কৃচ্ছসাধনের মধ্যে শিক্ষার্থীদের আশ্রমিক জীবন গড়ে উঠত। আশ্রমে শিক্ষার্থীদের কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করতে হত। মাদক দ্রব্য, বিলাস-সামগ্রী, বেশভূষা, অট্টহাসি, যেখানে সেখানে থুথু ফেলা, গুরুর সামনে বসা ও চলাফেরা করা শিক্ষার্থীদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। আশ্রমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শারিরীক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষা এবং শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত। গুরু গৃহে শিক্ষার্থীরা তাঁর পরিবারের একজন হয়ে বসবাস করত। এবং বিভিন্ন সময় ভিক্ষা করে, কাঠ কেটে এনে ও অন্যান্য কাজকর্ম করে গুরুর পরিবারকে সাহায্য করত।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
4

বৈদিক শিক্ষার অন্যান্য দিক

বৈদিক সমাজে নারীর স্থান ছিল উচ্চ - শিক্ষায় নারী-পুরুষের কোন ভেদ ছিল না। সে যুগে মেয়েরা বেদ পড়ত, মেয়েদের উপনয়ন হত ও তাঁরা গুরুগৃহে গিয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করত। সে যুগে স্ত্রী-শিক্ষা স্বীকৃত হয়েছিল। সে যুগে অনেক শিক্ষিত মেয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে অনেক অধ্যাপনা করতেন, পুস্তক রচনা করতেন, অনেকে যুদ্ধ করতেন। প্রচলিত পাঠক্রম ছাড়াও মেয়েরা নৃত্য, গীত, বাদ্য,

সূচী শিল্প, কবিতা, রচনা, মাল্য রচনা, দেহচর্চা ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করত। আর্যরা যুদ্ধবিদ্যার পারদর্শি ছিলেন। তাই ব্রাহ্মণ্য শিক্ষায় অস্ত্রবিদ্যা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। ক্ষত্রিয়দের উপনয়ন ছাড়াও ধনুর্বেদ উপনয়নের ব্যবস্থা ছিল। নগর ও জনপদের অধিবাসীরা নিজেদের রক্ষা করবার জন্য যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ত করত - যুদ্ধবিদ্যা কেবলমাত্র ক্ষত্রিয়দের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় কারিগরী বৃত্তিমূলক শিক্ষাও প্রাধান্য পেয়েছিল।

প্রশ্নাবলী

টিপ্পনী

নিজস্ব সফলতার বিচার করন -

(১) বৈদিক শিক্ষা বলতে কী বোঝ ?

(২) বৈদিক শিক্ষার পাঠক্রমের অন্তর্গত দুটি বিষয়ের উল্লেখ কর।

(৩) শ্রণ,মনন, নিদিধ্যাসন বলতে কী বোঝ ?

(৪) বৈদিক যুগে শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা কর।

টিপ্পনী

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
6

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থা

টিপ্পনী

নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়ের শেষে শিক্ষার্থীরা -

(১) ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার সময়কাল সম্পর্কে অবগত হবে।

(২) ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে বলতে পারবে।

(৩) ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠক্রম সম্পর্কে ধারণা প্রদাণ করতে পারবে।

(৪) ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় একাধিক শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সম্পর্কে জ্ঞাত হবে।

(৫) ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থার শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে।

(৬) ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে।

সুচনা

বৈদিক ও তৎপরবতী হিন্দু সমাজ শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে যে বিশেষ ভাবে অবিহিত ছিল, তা প্রাচীন ঋষিদের বিভিন্ন উক্তি থেকের স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হয়। ঋগ্বেদে ঋষি বলেছেন একজন মানুষ যে অপর একজনের থেকে শ্রেষ্ঠ হয়, তা তার অতিরিক্ত হত বা চক্ষুর জন্য নয় ; শিক্ষার দ্বারা তার মন উন্নত হয়েছে বলেই সে শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ বৈদিক সমাজে শ্রেষ্টত্বের দাবি জন্মগত ছিল না। বিদ্যাই সমাজে মানুষকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, এই ছিল প্রাচীন বৈদিক ঋষিদের বিশ্বাস। তাঁরা মনে করতেন, আবকিছু থেকে মুক্ত হয়ে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য সাধনে অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হওয়ার প্রেরণা কেবলমাত্র শিক্ষাই যোগাতে পারে। তাই তাঁরা বলেছেন - "সা বিদ্যা যা বিমুক্তেয়"। বিদ্যাই দেয় মানুষকে মুক্তির সন্ধান। পরবর্তী বৈদিক যুগে বা মহাকাব্যের যুগেও শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে অনুরূপ ধারণা প্রচলিত ছিল। মহাকাব্যের যুগেও শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে অনুরুপ ধারণা প্রচলিত ছিল। মহাভারতে বলা হয়েছে - "নাস্তি বিদ্যাসমং চক্ষুঃ নাস্তি সত্যসম্যং তপঃ"। বিদ্যাই মানুষকে দৃষ্টিদান করে আর সত্যকে অনুশীলন করাই জীবনের পরম তপস্যা। জ্ঞান হচ্ছে মানুষের তৃতীয় নেত্র, এই দৃষ্টির সাহায্যে আমরা সব কিছুর গভীরে প্রবেশ করতে পারি। তাই শিক্ষা মানুষের জন্য তার মনুসত্ত্য বিকাশের জন্য একান্ত ভাবে প্রয়োজন। পরবর্তীকালে ভর্তৃহাচরি বিদ্যাহীণকে পশু হিসাবে অভিহিত করেছেন।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
7

আদিও এবং পরবর্তী বৈদিক সমাজ শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিল বলেই মানুষকে শিক্ষা গ্রহণে অনুপ্রাণিত করেছে, জাগতিক এবং পপামার্ধিক দিক থেকে বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলার জন্যই এক সুপ্রাচীণ সুসংবদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে বহুমুখী প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে।

শিক্ষার লক্ষ্য

টিপ্পনী

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার চরম লক্ষ্য ছিল, আত্মজ্ঞান ও আত্মোপলব্ধি । "আত্মানাং বিদ্ধি", ভারতীয় ঋষিগণ জাগতিক সুখকে জীবনের চরম লক্ষ্য মনে করেননি । জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজেকে জানবার জন্য এবং সত্যকে উপলব্ধি করবার জন্য আর্য ঋষিরা সাধনা করে গেছেন। সুখ দুঃখের অতীত এক উপলব্ধিকে সন্ধান তাঁরা করেছেন । তাই শিক্ষার চরম লক্ষ্য হিসাবে এই আত্মজ্ঞান ও আত্মোপলব্ধিকে তাঁরা গ্রহণ করেছেন । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর্য ঋষিরা ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না । ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনকে অতিক্রম করা বা দেহের চাহিদাকে অতিক্রম করাই প্রকৃত শিক্ষা, একথা তাঁরা বললেও দেহকে নিজস্ব মূল্য আছে, নিজস্ব দাবি আছে। তবে সেই দাবির উর্ধ্বে তাকে স্থান দেওয়া চলবে না । অর্থাৎ শুধুমাত্র ব্রহ্মবিদ্যা বা আত্মোপলব্ধির বিদ্যা অনুশীলন করলে চলবে না। উপনিষদের নির্দেশ অনুযায়ী দুই প্রকার বিদ্যার অনুশীলন করা মানুষের পক্ষে প্রয়োজন। পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা। ব্রহ্মবিদ্যা বা আধ্যাত্মবিদ্যাই হল পরাবিদ্যা । অন্যদিকে যাবতীয় বিজ্ঞান, শিল্প ও কলা ইত্যাদি অপরাবিদ্যা । পরাবিদ্যা অর্থাৎ বিজ্ঞান, শিল্প ও কলা ইত্যাদির অনুশীলন জগতে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন। পাখী যেমন দুটি পাখার উপর ভর দিয়ে আকাশে ওড়ে একটি পাখা দিবে পারবে না, তেমনি কেবলমাত্র পরাবিদ্যা বা কেবলমাত্র অপরাবিদ্যা দ্বারা মানুষের হয় না। উপনিষদে বলা হয়েছে যারা কেবলমাত্র অপরাবিদ্যা অনুশীলন করে, তারা অজ্ঞান অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে। কিন্তু তার চেয়েও বেশী অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় তারা, যারা কেবলমাত্র পরাবিদ্যা অনুশীলন করে। তাই ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারিত করতে গিয়ে পন্ডিতগণ এই পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা অনুশীলনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন। প্রাচীন ঋষিগন মনে করতেন এই পপরা ও অপরাবিদ্যায় যথেষ্ট পাদর্শিতা লাভের জন্য শিক্ষার্থীর পরিপূর্ন ব্যাক্তিসত্তা বিকাশের প্রয়োজন। তাই এককথায় বলা যায়, শিক্ষার্থীর চরম আত্মবিকাশ ঘটিয়ে নাগরিক জীবনযাপনের উপযোগী করে গড়ে তোলাই ছিল, প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য।

পাঠক্রম

বৈদিক যুগে শিক্ষার পাঠক্রম খুব ব্যাপক ছিল না। কিন্তু সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভারতে একদিকে যেমন ওদানের ক্ষেত্রের বিস্তৃতি ঘটতে লাগলো, তেমনি অন্যদিকে সমাজ সংগঠনের মধ্যে পরিবর্তন হল। ফলে, বৈদিক যুগে যেখানে

বেদ অধ্যায়নই ছিল শিক্ষার একমাত্র বিষয়বস্তু বা পাঠক্রম, সেখানে ব্রাহ্মণ্য যুগে এসে শিক্ষার পাঠক্রম হল বহুমুখী। অন্যদিকে আর্য সমাজে ক্রমে শ্রেনীভেদ প্রথা গড়ে উঠতে থাকে, গুন ও কর্ম অনুসারে। যাগযজ্ঞ, অধ্যায়ন, অধ্যাপনা ইত্যাদি নিয়ে যারা রইলেন, তারা ব্রাহ্মণ রাষ্ট্রনীতিতে দক্ষ, যুদ্ধে নিপুন বীর সম্প্রদায় হলেন ক্ষত্রিয়, কৃষিকাজ, পশুপালন ও ব্যবসা - বাণিজ্যে কুশল সম্প্রদায় হলেন বৈশ্য এবং অনার্য জাতি শূদ্র বলে পরিচিত হলেন। যতদিন এই জাতিভেদ প্রথা কেবলমাত্র গুণ ও কর্ম নির্ভর ছিল, ততদিন আর্য সমাজের গতিশীলতা ব্যাহত হয়নি। প্রাচীন ভারতে জন্মই জাতিভেদের নিয়ন্তা ছিল না। রুচি, প্রবণতা ও ক্ষমতা অনুসারে প্রত্যেকের বৃত্তি ত্যাগ ও গ্রহণের স্বাধীনতা ছিল। প্রচীন বর্ণভিত্তিক সমাজের উদারতা থেকে শিক্ষার পাঠক্রম শিক্ষার উদ্দেশ্যমূখী এবং জীবনমুখী হয়ে ওঠে । ব্রাহ্মণ্য যুগে শিক্ষার পাঠক্রম বর্ণভিত্তিক হয়ে ওঠে ।। এদের মধ্যে শূদ্রদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা না থাকলেও, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রত্যেক বর্ণের জন্য পৃথক পৃথক পাঠক্রমের ব্যবস্থা করা হল। তিন বর্ণশ্রেণীর মধ্যে ব্রাহ্মণের জন্য নির্দিষ্ট পাঠক্রমই ছিল স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং বিস্তৃত। ব্রাহ্মণদের মূল কাজ ছিল ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করা ও অধ্যাপমনা করা। তাই ব্রাহ্মণ্যদেদর বিশেষভাবে বেদেদর সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ বিশেষ ভাবে অধ্যায়ন করতে হলত । বেদাঙ্গে পারদর্শীতা লাভ না করলে বৈদিক অনুষ্ঠান ও বেদপাঠ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যেত না। 'শতপথ ব্রাহ্মণে' এই পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির একটি বিস্তৃত তালিকা আছে। এই তালিকায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি হল - বেদ, বেদাঙ্গম, ভূতবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ, সর্পবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, দেবজ্ঞান ইত্যাদি। তখনকার দিনে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শিক্ষার্থীরা ব্রাহ্মণ গুরুর কাছ থেকেই শিক্ষাগ্রহণ করতো তাই ব্রাহ্মণের শিক্ষাকালে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বৃত্তি সম্পর্কে ও জ্ঞান আহরণ করা প্রয়োজনীয় ছিল , তাই ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায় বর্ণশ্রেষ্টদের শিক্ষার পাঠক্রম ছিল বহু বিস্তৃত । তবে প্রতিটি ব্রাহ্মণ শিক্ষার্থীর পক্ষে এতগুলি বিদ্যা একসঙ্গে অর্জন করা বাস্তব বিচারে অসম্ভবই ছিল। তা ছাড়া একই গুরুর পক্ষে এতগুলি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব ছিল। তাই অনুমান করা যায়, এই পাঠক্রমকে ব্রাহ্মণ শিক্ষার্থীদের বিষয় নির্বাচন করার এবং গুরু নির্বাচন করার সুযোগ ছিল। বৈদিক যুগে এবং আদি ব্রাহ্মণ্য যুগে বেদ পাঠের উপর কঠোর বিধি নিষেধ আরোপিত হয়নি । ফলে এই সময় ক্ষত্রিয়দের পাঠক্রমে বেদ পাঠ আবশ্যিক ছিল। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে ক্ষত্রিয় সমাজ বেদ বিদ্যা পরিহার করতে শুরু করে । খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্প্রদায় বেদ শিক্ষার অধতিকার থাকে বঞ্চিত হয়। এই সময় থেকে ক্ষত্রিয় শিক্ষার্থীদের প্রধানত তাদের জাগতিক বৃত্তি অর্থাৎ অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করতে হত। তরবারি, তীরধনু, গদ, ভন্ন প্রভৃতি অস্ত্রের ব্যবহার শিক্ষা নিতে হত। এই অস্ত্রবিদ্যা ছাড়া ও যুদ্ধ পরিচালনার কৌশল ও ব্যূহচনার পদ্ধতিও ক্ষত্রিয়রা আয়ত্ত করতো । শাসনকার্যে যোগ্যতা অর্জনের জন্য রাজপুতদের যুদ্ধকৌশল ও অস্ত্রবিদ্যার সঙ্গে রাজনীতি ও ধর্মনীতি সম্পর্কে বহু বিষয় জানতে হত। কল্পশাস্ত্র থেকে জানা যায়, নীতিশাস্ত্র, অর্থশাসৎত্র, বার্তা (কৃষি, গো-

টিপ্পনী

টিপ্পনী

পালন, বাণিজ্য বিদ্যা ইত্যাদি), দন্ডনীতি, সঙ্গীত, কাব্য, লেখন ইত্যাদিও রাজকীয় বিদ্যার অন্তর্গত ছিল। ক্ষত্রিয় রাজকুমারেরা তাত্ত্বিক বিদ্যাগুলি ব্রাহ্মণ গুরুর কাছ থেকে শিখলেও ব্যবহারিক বিদ্যাগুলি শিক্ষার জন্য অনেক সময় তাদের অব্রাহ্মণ কর্মচারীদের উপর নির্ভর করতে হত। প্রাচীন ভারতীয় বৈশ্যসমাজের কৌশল বৃত্তি ছিল কৃষি ও বাণিজ্য। বিভিন্ন বৃত্তি অনুসারে বৈশ সমাজ বহু শাখায় বিভক্ত ছিল। এক-একটি সম্প্রদায় এক একটি বিদ্যা শিখত। বৈশ্যদের তাদের পৈতৃক বৃত্তি অণুযায়ী শষ্য বপন, জমির গুনাগুন নির্ণয়, পশুপালন, বিভিন্ন প্রকার পরিমাপ ব্যবস্থা, ক্রয় বিক্রয় নিয়ম, দ্রব্য সংরক্ষনের উপায়, বিভিন্ন প্রকার পরিমাপ রত্ন ও ধাতুর মূল্য নির্নয়ের পদ্ধতি ইত্যাদির মত বিভিন্ন ব্যবহারিক বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে হত। তা ছাড়া, ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষ্যে বৈশ্য সাম্প্রদায়কে ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানুষের সংস্পর্শে আসতে হত। এজন্যে তাদের বিভিন্ন দেশের ভাষা, মুদ্রামূল্য এবং ভৌগলিক অবস্থান সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে হত। বৈশ্যদের মধ্যে পারিবারিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। পিতার কাছে পুত্র প্রথমে কৌলিণ্য বৃত্তিতে দীক্ষীত হত। বৈশ্য সাম্প্রদায়েচর জন্য পরিবারের বাইরেও বিশেষধর্মী উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। যেমন, তক্ষশীলায় চিকিৎসাবিদ্যা, শল্যবিদ্যা, কৃষি, বাণিজ্য, হিসাব সংরক্ষণ ইত্যাদির মত বৈশ্য বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ব্রাহ্মণ্য যুগে শূদ্রদের প্রথাগত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। তাদের বেদপাঠে অধিকার ছিল না। দৈহিক শ্রমসাধ্য কাজে তাদের নিয়োগ করা হত। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যাতিক্রম ও দেখা গেছে। প্রাচীন ভারতীয় বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থার পাঠক্রম সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল তার থেকে বোঝা যায় এই পাঠক্রমক আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানের পরিভাষায় একই সঙ্গে সাধারণ ধর্মী এবং বিশেষধর্মী ছিল। এই দুই বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে ঐ পাঠক্রম ছিল বহুমুখী কিন্তু আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা মত সুসংগঠিত নয়।

বিদ্যারম্ভ ও উপনয়ন

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শুরু হত। এই অনুষ্ঠানকে বিভিন্ন নামে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন - 'বিদ্যারম্ভ', চৌল কর্ম', 'চূড়াকরণ' বা 'অক্ষর স্বীকরন' ইত্যাদি। সাধারণত শিশুর পাঁচবছর বয়সে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হত। এই অনুষ্ঠানের পর শিশু গৃহ পরিবেশে পিতার কাছে শিক্ষাগ্রহণ করতো। এই শিক্ষা কাল বিভিন্ন বর্ণের শিশুর ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ছিল। ব্রাহ্মণ সন্তানদের ক্ষেত্রে এই শিক্ষাকাল ৮বছর বয়স কাল পর্যন্ত ব্যপ্ত ছিল। অন্যদিকে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের ক্ষেত্রে এই শিক্ষাক্রম ছিল যথাক্রমে ১১ ও ১২ বছর বয়সকাল পর্যন্ত নিদিষ্ট। এই সময় শিশুরা পরিবারের মধ্যে থেকে বেদের প্রথম পাঠ গ্রহণ করতো। কিন্তু ক্রমে বৈদিক শিক্ষা জটিল হয়ে ওঠায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিশেষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন গুরুকুলের আবির্ভাব হল। তখন গুরুগৃহ অপরিহার্য হয়ে পড়লো, আর তার সঙ্গে যুক্ত হন আর ধর্মীয় অনুষ্ঠান থাকে বলা উপনয়ন। ব্রাহ্মণ্য

শিক্ষাব্যবস্থায় উপনয়ন ছিল একটি আবশ্যিক সংস্কার। উপনয়নের মধ্য দিয়ে আর্য শিশু বিদ্যাগ্রহনের উপযুক্ত হত - তার নবজন্ম হত - সে গুরুর নিকটে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতো। শিক্ষাকালে গুরু পরিবর্তন করলে আবার নতুন করে উপনয়নের প্রয়োজন হত। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রবেশের পূর্বে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের জন্য উপনয়ন একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলে বিবেচিত হত। ব্রাহ্মণ সন্তানদের আট, ক্ষত্রিয় সন্তানদের এগারো এবং বৈশ্য সন্তানদের বার বছর বয়সে উপনয়ন হত। তবে প্রয়োজন বোধে এই বয়স যথাক্রমে ষোল, বাইশ ও চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত বাড়ানো হতো। উপনয়ন অনুষ্ঠানের পর শিক্ষার্থী সমিধভার করে গুরুর সামনে উপস্থিত হত এবং তাঁকে প্রণাম করে, ব্রহ্মচর্যাশ্রম গ্রহণ করতে অনুরোধ করতো। শিক্ষার্থী গুরুর সামনে উপস্থিত হলে, তিনি তার নাম, পিতৃপরিচয়, গোত্র ইত্যাদি জেনে তাকে গ্রহণের উপযুক্ত মনে করলেই তাকে ছাত্ররূপে গ্রহণ করতেন। বহু সময়ে উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে বিদ্যার্থীকে বহুদূরে যেতে হত। গুরু ছাত্র - নির্বাচনের সময় দেখতেন, ছাত্র শারিরীনক দিক থেকে রোগমুক্ত কিনা, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্প্রদায়ের বৃত্তির সঙ্গে বেদের কোন সম্পর্ক না থাকায়, তারা ক্রমে তাদের বৃত্তি সম্পর্কীয় শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। ফলে এক সময় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের মধ্য থেকে উপনয়ন সংস্কার উঠে যায়।

টিপ্পনী

শিক্ষালয়

এদি বৈদিক যুগে তপোবন ধ্যানমগ্ন ঋষিরা মানুষের মনেদর অজ্ঞানতারূপ অন্ধকার দূর করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাই প্রাচীন ঋষিরা হলেন প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার আদি গুরু বা আধুনিক অর্থে শিক্ষক। আর তাঁদের নির্জন প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত কুটির গুলি ছিল ভারতীয় শিক্ষালয়ের আদি রূপ। উপনয়নের পর তরুন বিদ্যার্থী বা ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে উপস্থিত হত। সম্পূর্ণ শিক্ষাকাল বিদ্যার্থীকে গুরুগৃহে থাকতে হত। তাই বিদ্যার্থীকে বলা হত 'অন্তোবাসী' বা আচার্য কুরবাসী। শিক্ষা শেষ না করে গুরুগৃহ ত্যাগ করা ধর্ম বিরুদ্ধ বলে মনে করা হত। এই ব্যবস্থায় গুরুগৃহ বা তপোবন আশ্রমটিকে একটি আবাসিক বিদ্যালয়ের রূপ ধারণ করতো। গুরুগৃহে বসবাস কালে চিন্তায়, বাক্যে এক কর্মে বিদ্যার্থীকে সংযত জীবন যাপন করতে হত। ভোরে গুরুর শয্যা ত্যগের পূর্বে শিষ্য শয্যা ত্যাগ করতো এবং রাতে গুরুর শয্যাগ্রহণের পর শিষ্য নিদ্রা যেত। সকালে স্নানের পর আহ্নিক করে শিষ্য গুরুর পরিচর্যার নিজেকে নিয়োগ করতো। গুরুগৃহের সবরকম কাজই শিষ্যকে করতে হত। যজ্ঞের জন্য সমিধ আহরণ ও গোধনের রক্ষণা বেক্ষণ ও তাদের দায়িত্ব ছিল। শিষ্যকে সংযত ও আরাম - বিলাস বর্জিত জীবন যাপন করতে হত। দিবা নিদ্রা; অপরিমিত আহার, মিষ্টান্ন ও মশলাযুক্ত গুরুপাক খাদ্যগ্রহণ , গন্ধদ্রব্য গ্রহণ, গৃত্য, গীত, বাদ্য ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ শিষ্যদের নিষেধ ছিল। গুরুর আদেশ শিষ্যকে মেনে চলতে হত। গুরুর সামনে হাই তোলা, থুতুফেলা, আঙুল মট্‌কানো, হেলান দিয়ে বসা, হাস্য

টিপ্পনী

পরিহাস করা , পায়ের উপর পা তুলে বসা নিষিদ্ধ ছিল। গুরু ডাকলে শিষ্য দূরে থাকলেও তাকে দাঁড়িয়ে সাড়া দিতে হত। শিষ্যকে সব সময় নীচাসনে বসতে হত। গুরুগৃহে বসবাসের সময় ভিক্ষা করা শিষ্যের পক্ষে আবশ্যিক ছিল। ভিক্ষার মধ্য দিয়ে শিষ্যেরা নম্রতার শিক্ষা লাভ করতো তা ছাড়া, যাদের কাছ থেকে শিক্ষার্থীরা ভিক্ষা গ্রহণ করছে, তাদের প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা তাদের মধ্যে জাগ্রত হত। শিক্ষার্থীদের মনে যাতে লোভের সঞ্চার না হয়। সেজন্য প্রয়োজনের অধিক শিক্ষা গ্রহণ নিষেধ ছিল। বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থার যুগে গুরুগৃহে শিক্ষার্থীকে কঠোর বিধি নিষেধের মধ্য দিয়ে চলতে হলেও, এর বিরুদ্ধে কেউ কোনও আপত্তি তোলেনি। শিষ্যেদর কল্যানের কথা চিন্তা করে, ছাত্র জীবনের জন্য যে বিধি নিষেধের ব্যবস্থা শিক্ষালয়ে করা হয়েছিল, তা পরবর্তীকালে শিষ্যের জীবনে কল্যাণকর রূপেই দেখা গিয়েছে।

শিক্ষালয়

বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায়, শিক্ষার্থীর শিক্ষাকাল নিয়ে পন্ডিতদের মনে কিছু কিছু বিভ্রান্ত আছে। বেদ শিক্ষার জন্য অত্যন্ত দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হত। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি শাস্ত্রকাররা বলেছেন, বিদ্যার্থী আমৃত্যু গুরুগৃহে বাস করে বেদ পাঠ করতে পারতো। মহাভারতে বলা হয়েছে জীবনের এক চতুর্থাংশ অধ্যায়নের জন্য অতিবাহিত করা উচিত। মেগাস্থানিসের বিবরণ থেকে জানা যায়, প্রাচীণ ভারতে বিদ্যার্থীরা সাঁইত্রিশ বছর কাল গুরুগৃহে থাকে অধ্যায়ন করতো। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পন্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, এত দীর্ঘদিন ধরে গুরুগৃহে থেকে অধ্যায়ন করা খুব কম সংখ্যক বিদ্যার্থীর পক্ষে সম্ভব ছিল। তাই পরবর্তীকালে বেদ পাঠের সময়কাল বারো (১২) বছর বা ষোল (১৬) বছর নির্ধারণ ককরা হয়। অর্থাৎ প্রত্যেকটি বেদ আয়ত্তের সময়সীমা চার বছর তিনটি বেদের জন্য বারো বছর ও চারটি বেদের জন্য ষোল বছর। কারণ সমাজের প্রয়োজনেই বিদ্যার্থীদের ব্রহ্মচারীদের গুরুগৃহে থেকে গৃহাশ্রমে ফিরে যাওয়া উচিত। সুতরাং এই হিসাবে অনুযায়ী আদি বৈদিক এবং ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থার কালে শিক্ষার্থীরা আট বছর বয়সে গুরুগৃহে এসে অধ্যায়ন শুরু করতো এবং চব্বিশ বছর বয়স কালের মধ্যে বিদ্যা শিক্ষা শেষ করে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে গৃহাশ্রমে প্রত্যাবর্তণ করতো।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
12

বাৎসরিক অবকাশ

আদি বৈদিক যুগে এবং পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য যুগে, গুরুগৃহে বাৎসরিক পঠন - পাঠনের সময় ও নিদিষ্ট ছিল। প্রতিবছর গড়ে প্রায় পাঁচমাস থেকে ছয়মাস শিক্ষার কাজ চলতো। শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষে বা কখনও কখনও শ্রাবণী পূর্নিমার দিন পাঠ শুরু হত। পৌষ, মাঘ মাস পর্যন্ত অধ্যায়নের কাজ চলতো। তারপর দীর্ঘ বিরতি। শ্রাবণ মাসে 'উপকর্মণ' অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পাঠের কাজ শুরু হত এবং মাঘ মাসের

শুক্লপক্ষের প্রথম দিন 'উপার্জন' অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বছরের অধ্যয়নের কাজ শেষ হত। ধর্মসূত্র অনুযায়ী জানা যায়, শুক্লপক্ষের বেদ ও কৃষ্ণপক্ষের বেদাঙ্গ পড়ানো হত। গুরুগৃহে পাঠের সময় ছুটি বা অন্যধায় দিবসের ব্যবস্থা ছিল বছরের দুধরনের অন্যতধার দিবস পালন করা হত। যে সব তিথিতে নিয়মিত পাঠ বন্ধ থাকতো তাকে বলা হত 'নিত্য অন্যধায়' দিবস এবং যে সব দিনে বিশেষ কোন কারণে পাঠ বন্ধ থাকতো তাকে বলা হত 'নৈমিত্তিক অনধ্যায়' দিবস। চন্দ্রগ্রহণের দিন, সূর্যগ্রহনের দিন, কোন কোন মাসের অমবস্যা, পূর্ণিমা ও অষ্টমী তিথির দিন নিত্য অনধ্যায় দিবস হিসাবে পালিত হত। রাজার মৃত্যু, রাজপুত্রর জন্ম অথবা মৃত্যু, রাজার পরাজয়, অশৌচকাল ও শিষ্যের মৃত্যুর দিনগুলি 'নৈমিত্তিক অনধ্যায়' দিবস হিসেবে বিবেচনা করা হত। তাছাড়া ধর্মশাস্ত্র প্রণেতারা নানা উপলক্ষ্যে বেদ পাঠ নিষিদ্ধ করে গিয়েছিলেন যেমন - দিনের বেলায় বজ্রপাত হলে, ধূলিঝড় উঠলে, রাতে শোঁ - শোঁ করে বাতাস বইলে, বাদ্যযন্ত্রে শব্দ শোনা গেলে, কুকুর, শেয়াল বা বালকের ডাক শোনা গেলে বেদপাঠ বন্ধ থাকতো। এই সব অনধ্যায় দিবস নির্ধারনের পেছনে অধিকাংশই ছিল সংস্কার। তবে নৈমিত্তিক অনধ্যায় দিবসগুলিতে বেদ ছাড়া অন্য বিষয় পাঠে কোন বাধা ছিল না। তবে পরবর্তীকালে, নৈমিত্তিক অনধ্যায় দিবসের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

টিপ্পনী

শিক্ষণ পদ্ধতি

প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরু কখনও সমষ্টিগত বা কখনও ব্যাক্তিগত ভাবে শিক্ষা দিতেন। সমষ্টিগত শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলে, গুরু প্রতিটি বিদ্যার্থীর সমর্থ বিচার করে শিক্ষা দিতেন। মহাভারত থেকে জানা যায়, ছাত্র সংখ্যা সাধারণত পাঁচ জনের বেশী হত না। তবে এর ব্যাতিক্রম ও ছিল। বিদ্যার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ শিক্ষার লক্ষ্য হওয়ায় শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষণ পদ্ধতি ছিল মূলত ব্যাক্তি কেন্দ্রিক। শিক্ষণ পদ্ধতি ছিল মৌখিক। গুরুর মুখে শুনে বিদ্যার্থীদের দৈনন্দিন পাঠ মুখস্ত করতে হত। তবে না বুঝে কোন কিছু মুখস্থ করার রীতি ছিল না।

(ক) উপক্রম

পাঠদানের কাজ শুরু হত উপযুক্ত পরিবেশ রচনার মাধ্যমে। যথা নির্দিষ্ট স্থানে গুরু শিষ্যরা বসতেন। এরপর শিষ্যেরা গুরুর পাদ বন্দনা করতো। এইভাবে দিনের অধ্যায়নের প্রস্তুতি হত। শিক্ষণের এই পর্যায় হল 'উপক্রম' (প্রস্তুতি)। এরপর গুরু শিষ্যদের সামনে কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করতেন। এবং শিষ্যরা তা সমস্বরে আবৃত্তি করতো। যে পর্যন্ত শিষ্যেরা নির্ভুলভাবে পাঠ অংশটি আবৃত্তি করতো। যে পর্যন্ত শিষ্যেরা নির্ভুলভাবে পাঠ অংশটি আবৃত্তি করতে পারছে সে পর্যন্ত শিক্ষণের দুটি পর্যায়ের পুনরাবৃত্তি ঘটতো। এখানে শিক্ষণ পদ্ধতিতে যে দুই পর্যায়ের কথা বলা হচ্ছে তার একটি হল 'শ্রবণ' এবং অপরটি হল 'আবৃত্তি'। এই পর্যায়ে প্রতিটি শব্দের

টিপ্পনী

উচ্চারণ সুদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত। শিক্ষণ পদ্ধতির পরবর্তী পর্যায়ে ছিল 'অর্থবাদ'। এই পর্যায়ে গুরু প্রত্যেকটি শব্দ ও শ্লোকের অর্থ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতেন। শিক্ষার্থীর সেই অর্থ বুঝতে সচেষ্ট হত। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় যুক্তি ও বিচারের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত। তাই শিক্ষণের পরবর্তী পর্যায়ে প্রশ্ন ও বিচার হত। শিষ্যেরা গুরুর সঙ্গে আলোচনা করে মুক্তির সাহায্যে জ্ঞানের ভিত্তিকে দৃঢ় করতো এবং তা প্রয়োগ করতো। এখানেও শিক্ষণের দুটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। একটি হল 'মনন' অন্যটি 'নিদিধ্যাস'। কোন কিছু বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করাকে বলা হয় মনন। আর নিদিধ্যাস হল একাগ্রচিত্তে ধ্যান করে সত্যকে উপলব্ধি করার চেষ্টা। এই সবশেষে পর্যায়ে, সমষ্টিগত ভাবে প্রদত্ত গুরুর শিক্ষা ব্যাক্তিগত অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত হয়ে সম্পূর্ণ শিক্ষণ পদ্ধতিকে ব্যাক্তিকেন্দ্রিক হয়ে উঠতে সহায়তা করতো। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর স্মৃতি - আবদ্ধ থাকতো এবং কালক্রমে তা শিষ্যদের মধ্যে সঞ্চালিত হত। তবে যান্ত্রিক স্মৃতি বা না বুঝে মুখস্থ করাকে উৎসাহ দেওয়া হতো না। যুক্তি নির্ভর স্মৃতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হত। তাই শিক্ষণ পদ্ধতিতে প্রশ্নোত্তর কৌশলের প্রচলন ছিল। প্রশ্নিন ও অভিপ্রশ্নিন এদের মধ্য প্রশ্নোত্তর ও বিচারের মধ্য দিয়ে পাঠ চলতো। গল্পের মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতি ও সে কালে পরিচালিত ছিল। 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'হিতোপদেশ' ছাড়াও বহু উপনিষদে দেখা যায়, ধর্মের গূঢ় তত্ত্বকে প্রাত্তলে করার জন্য গল্পের সাহায্যে নেওয়া হয়েছে। জটিল ও নীরস বিষয়কে সহজ ও সচল করে তোলার জন্যে এ পদ্ধতির অভিনবত্ব অনস্বীকার্য। গুরু ছাড়াও উন্নত তরের বিদ্যার্থীদের ও শিক্ষাদানের অধিকার ছিল। মনু থেকে জানা যায় আচার্য পুত্র অধ্যাপনায় পিতাকে সাহায্য করতেন।

(খ) সমদিষ্ট

পরবর্তীকালে শিক্ষার্থীরা গুরুর আদেশে নবাগত শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় সাহায্য করতো। এদের বলা হয় সমাদিষ্ট। এইসব সমাদৃষ্টদের বা পড়ুয়া শিক্ষকদের গুরুর মতই সম্মান দিতে হত।

শিক্ষক / গুরু

প্রাচীন হিন্দু সমাজে এবং শিক্ষা ব্যবস্থায়, গুরু বা শিক্ষক ছিলেন পরম শ্রদ্ধার পাত্র। অথর্ব বেদে বলা হয়েছে - পিতামাতা সন্তানের দেহ সৃষ্টি করেছেন। শিক্ষা তাকে দিয়েছে নতুন জন্ম। আর এই শিক্ষা সে লাভ করেছে গুরুর কাছ থেকে। তাই গুরুকে শুধু শ্রদ্ধাই করা হত না, শিষ্য সম্পূর্ণভাবে গুরুর হাতে নিজেকে সমার্পণ করতো। গুরুও শিষ্যকে অতি আপন করে গ্রহণ করতেন। শিষ্য গুরুগৃহে আপন পুত্রের মত বসবাস করে বিদ্যার্জণ করতো। শিষ্য গুরুর পরিবারের একজন সদস্য বলে বিবেচিত হত। গুরু শিষ্যের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতেন। আহার, বিহার, নিদ্রা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে করনীয় ও অকরনীয় বিষয়ে গুরু উপদেশ দিতেন। এছাড়া গুরু-শীষ্যের রোগ শয্যের পাশে থেকে মায়ের মত সেবা করতেন। তিনি কোন আর্থিক

লাভের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে শিক্ষকতা করতেন না। বিনা পারিশ্রমকেই গুরু শিক্ষা দিতেন। গুরু হতেন ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি। তিনি পক্ষপাত শুণ্য সমদৃষ্টি নিয়ে শিষ্যদের সমভাবে এবং প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন হতেন। বেদের বিভিন্ন সূত্র গুলিকে সরস ওই সরলভাবে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতার অধিকারী হতেন অর্থাৎ এককথায় প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষায় গুরু যেমন একদিকে ছিলেন বিদ্বান তেমনি শিক্ষাদানের বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট অন্তদৃষ্টিও প্রয়োগ করার ক্ষমতা ছিল। গুরু অকুণ্ঠ চিত্তে তাঁর সমস্ত বিদ্যা শিষ্যকে বঞ্চিত করতেন, তাহলে তিনি আর্চায নামের অযোগ্য বলে বিবেচিত হতেন। শিষ্যের নিকট পরাজয় গুরুর কাছে অগৌরবের ছিল না। প্রাচীন ভারতে আচার্যগণ বিদ্যাকেই জীবনের পরম আকাঙ্খিত বলে বিবেচনা করতেন। তাই অর্থ, রাজ-সম্মান, যশ সব কিছুতেই ত্যাগ করে তাঁরা শিক্ষকতাকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এই কারণে তাঁদের সমাজে স্থান ছিল সবার উপরে। তা ছাড়া, ব্যাক্তিত্ব, উন্নত চরিত্র, জীবনাদর্শ, ত্যাগ, গভীর জ্ঞান, ধর্মে ঐকান্তিক, অনুরাগ ও কর্মে ঐকান্তিক নিষ্ঠার জন্য গুরুরা তৎকালীন সমাজে সকলের পূজ্য ছিলেন।

টিপ্পনী

শিক্ষার ব্যয়ভার

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ অবৈতনিক। শিষ্যের কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ বলে বিবেচিত হত। দরিদ্রতম শিক্ষার্থীকে ও গুরু ফিরিয়ে দিতে পারতেন না। যেখানে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক পিতা ও পুত্রের ন্যায় ছিল। সেখানে দেনা-পাওনার সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবে ছিল নিন্দনীয়। যেখানে গুরু (শিক্ষক) অর্থের বিনিময়ে বিদ্যা বিক্রি করতেন, সেই বিদ্যা - ব্যবসায়ী শিক্ষক কোন ধর্মীয় অণুষ্ঠান পরিচালনার অযোগ্য বলে বিবেচিত হতেন। শিক্ষার্থীরা ভিক্ষার মাধ্যমে নিজেদের ব্যায় নির্বাহ করতো। রাজারা ও সাধারণ ব্যাক্তিরা পরোক্ষভাবে গুরুদেদর অর্থ সাহায্য করতেন। কেবলমাত্র শিক্ষা শেষে শিষ্য গুরুকে গুরুদক্ষিণা দিতেন। গুরুর অনুমতি নিয়ে গৃহে ফিরে যাওয়ার পূর্বে স্নাতক তার সাধ্যামত গুরুদক্ষিণা দিত। সমাবর্তনের পূর্বে গুরুকে কোন উপাহার দেওয়ার প্রথা ছিল না। তবে এই ব্যবস্থা পরবর্তী কালে পরিবর্তন হয় এবং শিষ্যদের বিদ্যাপন দেওয়ার প্রথা চালু হয়। যেসব বিদ্যার্থীরা বিদ্যাপন দিতে অসামর্থ হত তারা শ্রমের বিনিময়ে বিদ্যার্জন করতো। তক্ষশীলায় প্রাচীন শিক্ষণ কেন্দ্রে এই ধরণের ব্যবস্থা ছিল।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
15

পরীক্ষা

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায়, আধুনিক অর্থে পরীক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। গুরুই তার শিষ্যদের যোগ্যতা নির্ণয় করতেন এবং সেই যোগ্যতার মাপকাঠিতে যে উত্তীর্ণ হত, তাকেই তিনি স্নাতক হিসাবে ঘোষনা করতেন। এছাড়া, শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা নির্ণয় করার জন্য বিতর্ক সভা, আলোচনা সভা বা বিদ্বৎসম্মেলন ইত্যাদির

আয়োজন করা হত। তপোবন রাজসভা বা যজ্ঞস্থলে এই সব সভা অনুষ্ঠিত হত। এইসব সভায় যোগ্য বিচারকগণ, শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা বিচার করতেন প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অথবা বিতর্কের মাধ্যমে।

সমাবর্তন

টিপ্পনী

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায়, শিক্ষার্থীর শিক্ষা বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হত। এই অনুষ্ঠান হল 'সমাবর্তন'। সমাবর্তণ অনুষ্ঠানের মনধ্য দিয়ে শিষ্যের বা শিক্ষ্যার্থীর গুরুগৃহে বাসের সমাপ্তি সূচিত হত। সমাবর্তন উৎসব খুব জাঁকজমক পূর্নভাবে অনুষ্ঠিত হত। বিদ্যার্থী শিক্ষা শেষে স্নান করে, নতুন কাপড় পরে, গলায় মালা দুলিয়ে, রথে বা হাতিতে চড়ে পন্ডিতমন্ডলীর সামনে উপস্থিত হত। এই পন্ডিতমন্ডলীর কাছে গুরু বিদ্যার্থীকে 'স্নাতক' হিসাবে পরিচয় করিয়ে দিতেন। এই স্বীকৃতি লাভের মধ্য দিয়ে বিদ্যার্থীর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পরিসমাপ্তি ঘটতো। উপনয়নের মধ্য দিয়ে যে জীবনের শুরু হত, সমাবর্তনে বিশেষ স্নান করে এবং দন্ত, মেখলা ও অজিন ত্যাগ করে, সে জীবনের শেষ হত। আনুষ্ঠানিক স্নান শেষ হওয়ার পর থেকে বিয়ের আগে পর্যন্ত বিদ্যার্থী স্নাতক হিসেবে বিবেচিত হত - 'বিদ্যাস্নাতক', 'ব্রতস্নাতক', এবং 'বিদ্যাব্রত স্নাতক'। যে বিদ্যার্থী সকল বেদ অধ্যায়ন করেছে, কিন্তু সমস্ত ব্রত পালন করেনি তাকে 'বিদ্যাস্নাতক' উপাধি প্রদান করা হত। যে বিদ্যার্থী সকল ব্রত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছে, কিন্তু সব বেদ গুলি আয়ত্ত করতে পারেনি তাকে 'ব্রতস্নাতক উপাধি' প্রদান করা হত। যে বিদ্যার্থী সমস্ত বেদ অধ্যায়ন করেছে এবং সকল ব্রত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছে, তাকে 'বিদ্যাব্রত স্নাতক' উপাধি প্রদান করা হত। এই অনুষ্ঠানে শিষ্য তার সাধ্যমত গুরু-দক্ষিণা, গৃহে ফেরার জন্য গুরুর অনুমতি ভিক্ষা করতো। গুরুও তাঁর অনুমতি জ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যকে ভবিষ্যত জীবন চলার পথে পাথেয় হিসাবে যে উপদেশ দিতেন তা সর্বদেশে শ্রেষ্ঠ আচরনীয় ধর্ম বলে বিবেচিত।

"সত্যং বদ, ধম্যং চর। স্বাধ্যায়নে মা প্রমদঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্মান্ন ভব। আচার্যদেবো ভব। অস্মাভব পরশুর্ভব। হিরণ্যমস্তৃত্যং ভব।। শত্যং শরদ আয়ুষো জীব সৌম।"

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
16

সত্যকথা বলবে। ন্যায় আচরণ করবে। বিদ্যাচর্চার পথ বর্জন করবে না। সত্য থেকে বিচ্যুতি হয়ো না। ন্যায় আচরণের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ো না। সৎ ভিন্ন অন্যপথে যেও না। পিতা, মাতা ও গুরুকে দেবতা জ্ঞান করবে। পর্বতের মত অচঞ্চল হও। কুঠারের মত তীক্ষ্নধার হও এবং স্বর্ণের মত মূল্যবান হও। হে সৌম, তুমি শতজীবী হও।" সমাবর্তণ উৎসবে শিষ্যেদর প্রতি গুরুর এই সর্বশেষ আর্শীবাদ বাণী একদিকে যেমন ভারতীয় শিক্ষার চরম উদ্দেশে অতলান্তিক গভীরতাকে উপলব্ধি করতে সহায়তা করে তেমনি অণ্যদিকে সাধারণ মানুষের গার্হস্থ্য জীবন যে কি মহান

আদর্শকে সামনে রেখে শুরু হত তার দিশা দেয়। তাই ইচ্ছাকরে বলি, এই উপলব্ধি আমাদের আধুনিক ভারতীয় শিক্ষার দিক নীর্ণয় করুক।

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

ব্রাহ্মণ্য যুগের অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হল তক্ষশিলা। নিম্নে এই সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

টিপ্পনী

তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাচীন ভারতের তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হয়েছে ব্রাহ্মণ্য যুগে। কিন্তু জীবন প্রবাহিত হয়েছে বুদ্ধযুগ পর্যন্ত। সুতরাং এই বিশ্ববিদ্যালয় উভয় ব্যবস্থার মধ্যে একটি যোগসূত্র রচনা করেছিল। প্রাচীন গান্ধারদের রাজধানী এবং জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ স্থানে রাজা ভরত কর্তৃক এই শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত বলে কথিত। রাওয়ালপিন্ডির কাছে তিনটি ভিন্ন স্থানে ধ্বংসাবশেষ আবিস্কৃত হওয়ায় অনুমান করা হয় যে ভাঙা - গড়ার মধ্য দিয়ে এর ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। বস্তুত পারসিক, গ্রীক, ব্যাক্ট্রিয়, শক্, কুশাণ আক্রমণেদর পথে ভারতের উত্তর পশ্চিম দ্বারে অবস্থিত তক্ষশিলার উত্থান - পতন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাগ্যকেও প্রভাবিত করে। বিদেশী লিপি, শিল্পকলা ও সাহিত্য রীতিও একে প্রভাবিত করেছে।

'তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়' কিন্তু কোন বৃহদায়তন যৌথ প্রতিষ্ঠান ছিল না। এখানে বহু পন্ডিতের সমাবেশ হয়েছিল মাত্র, তাই সারা ভারত থেকে ছাত্র সমাবেশ ঘটেছিল। কিন্তু প্রতিটি শিক্ষক ও বিদ্যালয় ছিল স্বয়ম্ভর। শিক্ষকেরই ছিল পাঠক্রম নির্ধারণ। শিষ্য গ্রহণ-বর্জনের সম্পূর্ণ অধিকার। কোন পাঠান্ধতিক পরীক্ষা কিংবা অভিক্ষাপত্রের ব্যবস্থাও ছিল না। কিন্তু এখানকার পান্ডিত্য ছিল। সর্বজনীন স্বীকৃত। প্রসেনজিৎ, জীবক, পানিনি ও কৌটিল্য তক্ষশিলারই অবদান। তাই সমগ্র উত্তর ও পূর্বভারত থেকে এখানে ছাত্র সমাবেশ ঘটত। বস্তুত শিক্ষকের খ্যাতিতেই ছিল বিশ্ববিদ্যালয় রুপে তক্ষশিলার প্রকৃত খ্যাতি।

তক্ষশিলা ছিল উচ্চতম শিক্ষা কেন্দ্র। তাই বালক শিক্ষার্থী এখানে ছিল না। প্রাথমিক শিক্ষার শেষে উচ্চ শিক্ষার্থী কিশোর আনুমানিক ১৬ বছর বয়সে এখানে প্রবেশ করতেন। শিষ্যরা সাধারণত গুরুগৃহে বাস করতেন। তবে বিত্তশালী শিষ্য নিজ ভরণ পোষনের ব্যায়ভার বহন করতেন। কিংবা নিজ বাড়ি করে থাকতেন। অনুমোদিত ছাত্রাবাস ও ছিল। তক্ষশিলার বহু বিদ্যালয়ে বেতনের রীতি ও ছিল। অবশ্য শিক্ষার শেষেও বেতন দেওয়া চলত। অনেক সময় স্থানীয় ধনীরা ছাত্রদের পোষন করতেন। তাছাড়া সামাজিক অনুষ্ঠানেও নিমন্ত্রণ ও ছিল অঢ়েল। বেতনও ছিল এত সামান্য যে তা দিয়ে বিদ্যালয় চলত না।সুতরাং শিক্ষককেও সমাজের উপরই নির্ভর করতে হত।

তক্ষশিলার কোন কোন বিদ্যালয়ে প্রচুর ছাত্র ছিল। চন্ডাল ছাড়া অন্য সবার ক্ষেত্রে শ্রেনী-বর্ণ-ঐশ্বর্যের ভিত্তিতে কোন বৈষম্য ছিল না। বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রেও বর্ণবিভাগ প্রকট ছিল না। সুতরাং শিক্ষায় গণতন্ত্র এবং কায়িক শ্রমের ভূমিকা কিছুটা স্থান পেয়েছিল। এইসব বিদ্যালয়ের সরল জীবনযাত্রার মধ্যে নিয়মানুবর্তিতার সুর ছিল উচ্চগ্রামে। সঙ্গতি ও মর্যাদা নির্বিশেষে সকলকে নির্দিষ্ট সময় নির্ঘন্ট অনুসারে নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন করতে হত।

টিপ্পনী

তক্ষশিলার পাঠক্রমের মধ্যে ছিল ত্রিবেদ, বহুবিধ বিজ্ঞান, কলা, কারিগরি এবং অষ্টাদশ শিল্প। বিশেষভাবে উল্লেখ করা চলে জ্যোর্তিবিজ্ঞান, জ্যোতিষ, বাণিজ্য, কৃষি, হিসাবরক্ষণ, সর্পবিদ্যা, ইন্দ্রজাল বিদ্যা, মৃগয়া বিদ্যা, বৈদবিদ্যা, চিকিৎসা, নৃত্য, অঙ্কণ প্রভৃতির কথা। এখানে বিমূর্ত এবং ব্যবহারিক ওদান সমন্বয়ের চেষ্টা হয়েছিল। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভেষজ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ব্যবস্থা ছিল। পাঠক্রমের সমতাকে অবলম্বণ করে অনেক ক্ষেত্রে শুধু ব্রাহ্মণ কিংবা সমতাকে অবলম্বন করে অনেক ক্ষেত্রে শুধু ব্রাহ্মণ কিংবা ক্ষত্রিয়ের জন্যও বিদ্যালয় ছিল।। শিক্ষান্তে দেশ ভ্রমণের ফলে জ্ঞানের গভীরতা এবং মনের প্রসারতে আসত।

কুশাণ যূগ পর্যন্ত বিশ্ব বিদ্যালয়ের গৌরব অক্ষুণ্ন ছিল। কিন্তু তার পরেই অবক্ষয় ঘটে। ফা হিয়েণ এখাণে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রত্যক্ষ করেননি।তারপর হুণ আক্রমণের ঢেউ এসে সব কিছু ধ্বংস করে যায়।সপ্তম শতকে হিউ-এন- সাঙ এর সময় এর অস্তিত্ব কিছু চিহ্ন বর্তমান থাকলে ও গৌরবের কোন চিহ্নই ছিল না।

অনুশীলনী

১) ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থার সময়কাল নির্দেশ কর।

২) ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার মূল লক্ষ্য কি?

৩) ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠক্রম কেমন ছিল ?

৪) ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনা পর্বে কোন অনুষ্ঠান পালন করা হত ?

৫) সমাদিষ্ট বলতে কী বোঝো ?

৬) তক্ষ্যশীলার একজন শিক্ষকের নাম উল্লেখ কর।

বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা

নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্যাবলী

এই অধ্যায়ের শেষে শির্ক্ষাথীরা -

১) বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনার প্রেক্ষাপট সর্ম্পকে জ্ঞান লাভ করতে পারবে।

২) বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য সর্ম্পকে জ্ঞাত হবে।

৩) বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠক্রম সম্পর্কে ধারনা লাভ করবে।

৪) বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার শিক্ষন-পদ্ধতি কেমন ছিল তা জানতে পারবে।

৫) বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে।

৬) বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ধারনা লাভ করবে।

৭) নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে।

৮) বৌদ্ধ শিক্ষা ধব্বংসের কারন সম্পর্কে জ্ঞাত হবে।

সূচনা

বৈদিক ধর্মের জটিলতার বিরুদ্ধে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া রুপে একদিন ভারতে বৌদ্ধও জৈন ধর্মের আর্বিভাব হয় । খীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকেই বৈদিক ধর্মে যাগযজ্ঞ,পশুবলি ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে নানা রকমের ক্রিয়াকান্ড ধর্মের প্রধান অঙ্গ হয়ে ওঠে। বর্নভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা, নিম্ন বর্নের লোকের প্রতি উচ্চবর্নের ঘৃনার ভাব, সমাজ জীবনে অসন্তোষের সৃষ্টি করে ।সহজ,সরল,সাধারন মানুষের পক্ষে বোধগম্য এমন এক ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সমাজে দেখা দেয় ।যেখানে সব মানুষেরই সমান অধিকার থাকবে, সকলেই নির্দ্বিধায় সকল ধর্মীয় কান্ডে অংশগ্রহন করতে পারবে । হিন্দুধর্মের সংস্কারগুলির পীড়ন থেকে মুক্ত হওয়ার প্রয়াসেই বৌদ্ধ ধর্মের আর্বিভাব। বুদ্ধদেবকেই ক্রিয়াকান্ড বহুল, কুসংস্কার জড়িত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহী বলা যায় । বুদ্ধদেব হিন্দুধর্মের প্রচলিত প্রথাসমূহের বিরোধিতা করেছিলেন ঠিকই,কিন্তু তিনি বেদ বিরোধী ছিলেন না । বিশিষ্ট পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ ম্যাক্সমূলার বলেছেন- "ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে বাদ দিলে,বৌদ্ধ ধর্মকে বাদ দিলে বৌদ্ধ ধর্মের অস্তিত্ব খুজেঁ পাওয়া মুশকিল।" বুদ্ধদেব সকলের পক্ষে বোধগম্য প্রাকৃতজনের ভাষায়,নতুন ধর্মের যে বানী প্রচার করেছিলেন,তা তিনি উপনিষদ থেকেই লাভ করেছিলেন। বুদ্ধদেব যাগযজ্ঞের বিরোধী ছিলেন, বেদ অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত এ কথা তিনি মানতেন না। এমন কোনো তত্ত্বের সন্ধান দেননি যা উপনিষদে নেই।

টিপ্পনী

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

টিপ্পনী

বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি:

"জীবন দুঃখময়' -শাক্য রাজকুমারের মনে প্রশ্ন জেগেছিলেন-এই দুঃখ কি?এই দুঃখের কারন কি? এই রহস্যকে তিনি চারটি আর্য সত্য রুপে প্রকাশ করেছেন-১)এ সংসার দুঃখময়, ২)এই দুঃখের কারন আছে, ৩)এই দুঃখের নিরোধ ঘটানো সম্ভব এবং ৪)এই দুঃখ নীরোধের পথ বা উপায় আছে। বুদ্ধদেব বলেছেন, মানুষের অজ্ঞতাই তার দুঃখের কারন। অজ্ঞতা দূর হলেই, সে নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবে এবং দুঃখের হাত থেকে সে মুক্তি পাবে। দুঃখ নিরোধের উপায় স্বরূপ বুদ্ধদেব যে আটটি পথের কথা বলেছেন ; সেইগুলিই বৌদ্ধধর্মের মূল নীতি। এইগুলি হল- (১) সম্যক দৃষ্টি, (২) সম্যক সংকল্প, (৩) সম্যক বাক্য, (৪) সম্যক কর্ম, (৫) সম্যক জীবিকা, (৬) সম্যক ব্যায়াম, (৭) সম্যক দান, এবং (৮) সম্যক সমাধি বা ধ্যান। বৌদ্ধ ধর্ম আর্বিভাবের প্রথম যুগে মানুষের গার্হস্থ্য জীবনের কোন গুরুত্ব ছিল না। বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত আচার্যদের কাছে সন্ন্যাসী ছিল জীবনের আদর্শ। বুদ্ধদেব বলেছিলেন সন্ন্যাসীর পক্ষেই কেবলমাত্র নির্বান লাভ সম্ভব। তিনি বলেছেন হিংসা এবং বাসনা পরিত্যাগ করে, অষ্টমার্গের নির্দেশানুসারে জীবনযাপন করতে পারলেই নির্বান লাভ করা সম্ভব। এই নির্বান লাভ কেবল মাত্র সন্ন্যাসীর পক্ষেই সম্ভব। তাই বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সংঘ জীবন যাপন করতেন। অবশ্য পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্মের পরিবর্তন ঘটে। মহাযান শাখা, মানুষের জীবন যাপনের ব্যাপারে,উদার দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহন করে এবং গৃহীদের ও ধর্মাচরনের অধিকার দেয়।

বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা কি?

বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থা থেকে পৃথক এক শিক্ষা ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। নব দীক্ষীত বৌদ্ধদের ধর্মের রীতিনীতি, আচার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়ার জন্যই বৌদ্ধরা এক নতুন ও নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। এই চাহিদা থেকেই যে শিক্ষাব্যবস্থার সূত্রপাত হয়। এবং পরবর্তীকালে পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে, তাকেই বলা হয় বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়। এবং পরবর্তীকালে পরিপুষ্ট হয়ে, তাকেই বলা হয় বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা (Buddhistic System of Educaction)। বৌদ্ধধর্ম যেমন একদিন আমাদের বৈদিক ধর্ম থেকে সৃষ্টি হয়েছিল। তাই তাদের মধ্যে সাদৃশ্য অনেক। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আচার আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হেসেবে বৌদ্ধধর্মের সৃষ্টি হলেও, তার মূলে ছিল উপনিষদীয় ধ্যাণ - ধারণা। এই একই কারণে, বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যস্থার নানা দিক সাদৃশ্য ছিল। তবে তাদের মধ্যে বৈসাদৃশ্যেরও অভাব ছিল না। বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্টগুলি বিচার করলে, আমাদের এ বিষয়ে বিচার করতে সুবিধা হবে।

শিক্ষার লক্ষ্য

বৌদ্ধ দর্শনে জীবনের পরম লক্ষ্য লাভ । জীবনের সকল দুঃখ থেকে স্থায়ীভাবে মুক্তি পাওয়ার উপায় হলে নির্বাণ লাভ । আর এই নির্বাণ লাভের জন্য অষ্টমার্গের অনুশীলন প্রয়োজন। বৌদ্ধ শিক্ষার লক্ষ্য একই। অর্থাৎ শিক্ষার্থীকে নির্বাণ লাভের পথে এগিয়ে দিতে সহায়তা করাই ছিল বৌদ্ধশিক্ষার লক্ষ্য । যেহেতু নির্বাণ লাভের পন্থা হিসাবে অষ্টমার্গের অনুশীলনকে স্থির করা হয়েছিল , সেহেতু বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ লক্ষ্য ছিল এই নীতিগুলিকে অনুশীলন করা এছাড়া, অসত্য, অন্যায়, অসৎ আচরণ, চৌর্যবৃত্তি এবং জীবনহিংসা পরিত্যাগ করার যে পঞ্চশীল নীতির কথা বৌদ্ধধর্মে বলা হয়েছে, সে বিষয়ে চারিত্রিক দৃঢ়তা সৃষ্টি করাও ছিল বৌদ্ধ শিক্ষার উদ্দেশ্য ।সুতরাং দেখা যাচ্ছে শিক্ষার্থীর ব্যাক্তিগত চারিত্রিক উন্নতিতে সহায়তা করা এবং জীবনের প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধিতে সহায়তা করাই ছিল বৌদ্ধশিক্ষার প্রধান লক্ষ্য । যে সকল ব্যাক্তিগত অভ্যাস, সংঘ বা সামাজিক জীবনের দিক থেকে কাম্য, সেগুলি অনুশীলনের সুযোগ সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা এই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ছিল।

বৌদ্ধশিক্ষার পাঠক্রম

বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত সংঘবাসী ভিক্ষুকদের জন্য সংগঠিত ছিল । তাই প্রথমযুগে এই শিক্ষার পাঠক্রমে ধর্মীয় বিষয় ও ধর্মীয় আচরণ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা গুলিকেই অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছিল । বুদ্ধদেব তার প্রচারিত ধর্মকে ব্রাক্ষণ্য ধর্মের গোঁড়ামির আক্রমন থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাই তিনি যে কোনো রকমের কূটতত্ত্বের আলোচনা থেকে ধর্মকে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন । বৌদ্ধশিক্ষার পাঠসূচী সেই ভাবে রচিত হয়েছিল। এই পাঠসূচী খুব ব্যাপক বা দীর্ঘ ছিল না । বিশেষভাবে বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটককে পাঠক্রমে স্থান দেওয়া হয়েছিল । ত্রিপিটকের তিনটি অংশ (১) সূত্র ত্রিপিটক, (২) বিনয়পিটক এবং (৩) অভিধর্ম্ম পিটক। সুত্রপিটকে আছে বুদ্ধদেবের উপদেশ ও বাণী। বিনয়পিটকে আছে বৌদ্ধ শ্রমণ ও ভিক্ষুদের পালণীয় কর্তব্য এবং অভিধম্মপিটকে আছে বৌদ্ধতত্ত্ব ও দর্শন সম্পর্কে আলোচনা। বৌদ্ধ শিক্ষার প্রথম যুগে সংস্কৃত, জ্যোতিষ, যাদু, লোকায়ত দর্শণ ইত্যাদি বিদ্যা শিক্ষার্থীদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীগণ হীনযান ও মহাযান সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয় । মহাযান সাম্প্রদায়ের মতবাদ ছিল উদার । তাই তাঁদের দ্বারা বৌদ্ধ শিক্ষার পাঠক্রমে লোকায়ত বিদ্যাগুলি অন্তর্ভুক্ত হয় । নালন্দা, বিক্রমশীলা ইত্যাদি প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্র গুলির পাঠসূচী নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়, বৌদ্ধ শীক্ষার পাঠক্রম পরবর্তীকালে অনেক বিস্তৃতি লাভ করেছে । ভেষজ, রসায়ন, স্থাপত্য, শিল্প, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদিও কালক্রমে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয় । এমনকি দেখা গেছে প্রাচীন বৌদ্ধশিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে এক সময় হিন্দু ও জৌনধর্মে বিভিন্ন মতবাদ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়ে ছিল । দেখা যায় বৌদ্ধ শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে

টিপ্পনী

এক সময় হিন্দু ও জৈনধর্মের বিভিন্ন মতবাদ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়েছিল। দেখা যায় বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা যতই পরিণত হচ্ছিল ততই তার প্রাথমিক নিজস্ব একক বৈশিষ্ট গুলি হ্রাস পাচ্ছিল এবং ক্রমে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার মধ্যে তার সমন্বয়ের ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যাচ্ছিল।

প্রবজ্যা

টিপ্পনী

বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা যেমন উপনয়ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হত, তেমনি বৌদ্ধ ভিক্ষু জীবনের আরম্ভ একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে হত। বৌদ্ধ সংঘে প্রবেশ করার এই অনুষ্ঠানকে বলা হয় প্রবজ্যা বা পবজ্যা। বৌদ্ধধর্মে জাতবিচার না থাকায়, যেকোন বর্ণের লোকই প্রবজ্যা গ্রহণ করতে পারতো। তবে এ বিষয়ে বর্ণভিত্তিক বিধি-নিষেধ না থাকলেও অন্যান্য কিছু বিধি - নিষেধ ছিল। প্রবজ্যা গ্রহণকারীর বয়স আট বছরের কম হলে চলতো না ও পিতা মাতার অনুমতি ছাড়া প্রবজ্যা গ্রহণ করা যেত না। এছাড়া রাজকর্মচারী, ক্রীতদাস, চোর - ডাকাত, হত্যাকারী, ঋণী, বিকলাঙ্গ, নপুংশক ও কুষ্ঠ, চর্ম, ক্ষয় বা মৃগী রোগীদের সংঘে প্রবেশের অধিকার ছিল না। বিনয়পিটক থেকে জানা যায়, প্রবেশার্থীকে প্রথম সংঘে আসার পর দশ থেকে তিরিশ দিন উপবাসে থাকতে হত। এই সময় তাকে পঞ্চশীল সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া হত। এরপর কেশ শ্মশ্রুমুন্ডন করে, হলুদ বস্ত্র উত্তরীয় ধারণ করতো এবং হাতে ভিক্ষা পাত্র গ্রহণ করতো। এই অবস্থায় তাকে দশজন ভিক্ষুক নিয়ে গঠিত এক পরিষদের সামনে উপস্থিত হতে হত। এই পরিষদ শিক্ষার্থীকে প্রবজ্যা দান করলে সে গুরুকে প্রণাম করে হাতজোড় করে বলতো - "বুদ্ধং শরনাং গচ্ছামি, ধর্মং শরনাং গচ্ছামি, সঙ্ঘ শরনাং গচ্ছামি।" একে বলা হত ত্রিশরণ। এইভাবে প্রব্রজ্যা অনুষ্ঠান শেষ হত এবং শিক্ষার্থীকে সংঘের অন্তর্ভুক্ত করা হত। তখন শিক্ষার্থীকে বলা হত শ্রমণ। এই প্রবজ্যা লাভের পর থেকে শিক্ষা শুরু হত।

শিক্ষাকাল

বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষাকাল তুলনামূলক ভাবে দীর্ঘ ছিল। যেহেতু এই শীক্ষাব্যবস্থায় প্রাথমিক পর্যায়ে সঙ্ঘে আবাসিক ভিক্ষুদের শিক্ষা দেওয়া হত, সেহেতু এই দীর্ঘ সময়ের জন্য শিক্ষা, সামাজিক অন্যান্য ব্যাক্তিদেদর অসুবিধতা সৃষ্টি করতো না। শ্রমনদের জন্য প্রবজ্যা কাল ছিল বার বছর ব্যাপী। অর্থাৎ আট থেকে কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত এই শিক্ষাকাল ব্যাপ্ত ছিল। কুড়ি বছর বয়স হওয়ার পর যদি উপযুক্ত বিবেচনা করা হত তবেই শ্রমণকে উপসম্পদা দেওয়া হত। উপসম্পদা হতে হলে দশজনের এক ভিক্ষু সঙ্ঘের অনুমোদনের প্রয়োজন হত। ভিক্ষুরা শ্রমণকে প্রশ্ন করতেন। ঐসব প্রশ্নের উত্তর শ্রমণ সন্তোষজনক ভাবে দিতে পারলে তবেই তাঁকে উপসম্পদা প্রদান করা হত। দশ বছর উপসম্পদা জীবন অতিবাহিত করার পর, অর্থাৎ প্রায় তিরিশ বছর বয়সে সে উপাধ্যায় হওয়ার অধিকার অর্জন করতো।

বাৎসরিক শিক্ষার সময়

সঙ্ঘের মধ্যে প্রধান উপাধ্যায়রা ধ্যান, সাধন ও অধ্যাপনার কাজ করতেন। শ্রমনদের জন্য ভিক্ষা করা আবশ্যিক ছিল। অন্যান্য ভিক্ষুরা বছরের বেশীরভাগ সময় ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করতেন। বর্ষার সময়, সকলে এসে বিহারে মিলিত হতেন। এই সময়কে বলা হত বর্ষাবাস। আর পড়াশুনার কাজ ও এই সময় হত। অর্থাৎ বছরের মধ্যে বর্ষাকালেই প্রথাগতভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। অবশ্য পরবর্তীকালে বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি বিস্তারের ফলচে যখন বড় বড় বিহার বা শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে ওঠে ; তখন এই বাৎসরিক অধ্যায়নের কাল দীর্ঘ হয় এবং বৎসর ব্যাপী চলতে থাকে।

টিপ্পনী

শিক্ষালয় বৌদ্ধ বিহার

বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় বৌদ্ধ বিহার গুলি ছিল এক একটি আবাসিক বিদ্যালয় বা ব্যাপক অর্থে শিক্ষালয়। বৌদ্ধ শিক্ষায় বৌদ্ধ সঙ্ঘ গুলিই নবীন দীক্ষিতদের ধর্মীয় ও নৈতিক জীবন গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করতো। বুদ্ধদেব মহানির্বাণের সময় নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর অবর্তমানে সঙ্ঘগুলিই তাঁর স্থান গ্রহণ করবে। নবীন শিক্ষার্থী সহ মঝঠে বসবাসকারী সকলকে সঙ্ঘেদর নিয়মকানুন পালন করতে হত সেগুলি হল - (১) আদত্ত গ্রহণ করবে না ; (২) প্রাণ হরণ করবে না ; (৩) মিথ্যা কথা বলবে না ; (৪) মত্ততা আনতে পারে এমন পানীয় গ্রহণ করবে না ; (৫) ব্রহ্মচর্য ভঙ্গ করবে না (৬) নৃত্যগীত করবে না ; (৭) মালা চন্দন, সুগন্ধী দ্রব্য ব্যবহার করবে না, (৮) কোমল শয্যায় বা উচ্চ শয্যায় শয়ন গ্রহন করবে না ; (৯) সোনা, রূপা দান হিসাবে গ্রহণ করবে না এবং (১০) বিকালে আহার করবে না। এদের মধ্যে প্রথম পাঁচটি শীল বৌদ্ধদের অবশ্য পালণীয় ধর্ম ছিল। শ্রমনদের কায়িক পরিশ্রমের কাজও করতে হত। তাদের নানা ভাবে গুরুকে সেবা করতে হত। ব্রাহ্মমুহূর্তে শ্রমণ শয্যা ত্যাগ করে নিজের প্রাতঃকৃত সমাধা করে, গুরুর মুখ প্রক্ষাননের ব্যবস্থা করে দিত ; তারপর আসন পেতে আহার্য এনে দিত। খাওয়া শেষ হয়ে গেলে পাত্র ও আহারের স্থান পরিষ্কার রাখতে হত। ভিক্ষায় বেরোনোর সময় গুরুকে বেশ পরিধানে সাহায্য করতে হত। ভিক্ষা থেকে ফিরে এলং গুরুর স্নানের ব্যবস্থা করতে হত। আহার্য পরিবেশন করতে হত এবং বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে হত। গুরু আদেশ দিলে শিষ্যকে ভিক্ষা কাজে গুরুকে অনুসরণ করতে হত। গুরু অসুস্থ হলে শিষ্যকে সেবা করতে হত। অন্যদিকে শিষ্য অসুস্থ হলে গুরুও তাকে সর্বপ্রকারে সেবা করতেন। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থার মত গুরুশিষ্যের সম্পর্ক ছিল পিতা - পুত্রের মত। প্রত্যেকটি শিক্ষালয়ে গুরু ও শিষ্য সমবেতভাবে একটি পরিপূর্ণ সার্থক সামাজিক পরিবেশ রচনা করে বসবাস করতেন। বুদ্ধদের নারীদের বৌদ্ধ সঙ্ঘে গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন না। পরে প্রিয় শিষ্যদের অনুরোধে তিনি সঙ্ঘে নারীদের গ্রহণের অনুমতি দেন। তবে সঙ্ঘে ভিক্ষুনিদের গ্রহণ করা হলেও তাদের ভিক্ষুদের প্রাধান্য মেনে চলতে হত। তাদের

টিপ্পনী

সম্পর্কে বিধিনিষেধও তুলনা মূলকভাবে কঠোর ছিল। সঙ্ঘের সাধারণ নিয়মাবলী ছাড়াও আরও বারটি বিশেষ নিয়ম ভিক্ষুনীদের মেনে চলতে হত। পুরুষদের সঙ্গে একঘরে থাকা, পুরুষদের স্পর্শ করা, একলা বেড়ানো, নদী পার হওয়া, বিয়েতে ঘটকের কাজ করা গুরুতর পাপ গোপন করা ওভিক্ষুনীদের নিষেধ ছিল। ভিক্ষুনীদের শিক্ষাদানের জন্য একজন ভিক্ষুকে নিয়োগ করা হত। তিনি এক ভিক্ষুর উপস্থিতিতে ভিক্ষুণীদের শিক্ষা দিতেন। এর থেকে বোঝা যায় বৌদ্ধ বিহারে, পুরুষ এবং নারী উভয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। তবে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক থেকে ওভিক্ষুণী সঙ্ঘের অবসান ঘটে। বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায়, শিক্ষালয় বা বৌদ্ধ বিহার গুলি তাদের কর্ম ও পরিধি ধীরে ধীরে বিস্তারিত করে। প্রথম অবস্থায় সেখানে কেবলমাত্র ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের শিক্ষাব্যবস্থা থাকলেও পরবর্তীকালে, তার দরজা জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। এই সব শিক্ষালয়ে ক্রমে গৃহীদের ধর্ম শিক্ষাদানের ও ব্যবস্থা করা হয়। অর্থাৎ বৌদ্ধ বিহার গুলিতে সংহাত ধারণ শিক্ষার্থীরা প্রবেশাধিকার লাভ করেছিল। তবে গৃহী শিক্ষার্থীদের ব্যায়ভার তারাই বহণ করত।

শিক্ষণ পদ্ধতি

বৌদ্ধ বিহারগুলিতে শিক্ষণ পদ্ধতি ছিল প্রধানত মৌখিক, বৌদ্ধ যুগে লিপির প্রচলন ছিল, বিভিন্ন বৌদ্ধ শাস্ত্র ও লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল কিন্তু বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় লিপির ব্যবহার ছিল কম। ফা-হিয়েন বলেছেন পাঞ্জাব অঞ্চলে মৌখিক ভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু ভারতের পুর্ব অঞ্চলগুলিতে লিপির প্রচলন ছিল। ই-ৎ -শিঙ এর বিবরণ থেকে জানা যায়, শ্রমনরা রাত্রির প্রথম ও শেষ যমে আচার্যর কাছে যেত, তিনি ত্রিপিটক থেকে সময়োপযোগী কোন অধ্যায় পাঠ দিতেন এবং তা বুঝিয়ে দিতেন। কোন বিষয় ছাত্রেদের কাছে অস্পষ্ট রাখতেন না। মুখস্থ করা ও আবৃত্তি করা এই দুটি ছিল শিক্ষার প্রধান কৌশল। বুদ্ধদেব নিজে আলোচনা ; উপদেশমূলক গল্প ও উপকথার মাধ্যমে তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন। বৌদ্ধ বিহারগুলিতে শ্রমণদের শিক্ষাদানের জন্য ও অনুরূপ কৌশল গুলি অবলম্বণ করা হত। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে মাতৃভাষা ও আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করা হত। বৌদ্ধ ধর্মের নীতিগুলিকে দৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির উপর স্থাপনের উদ্দেশ্যে ও প্রতি পক্ষের যুক্তিকে খন্ডন করার জন্য বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জ্ঞানমার্গিক শিক্ষায় পারদর্শী হতে হত। তাই বৌদ্ধ শিক্ষাপদ্ধতিতে বিতর্ক ও আলোচনার একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষণ পদ্ধতি প্রথম অবস্থায় ব্যাক্তিকেন্দ্রিক ছিল। আচার্য ব্যাক্তিগতভাবে শিষ্যের শিক্ষা বিধান করতেন। পরে বৌদ্ধ বিহারগুলিতে শ্রমণের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায়, সেখানে শ্রেনী শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। যে সব বৌদ্ধ বিহার উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র বা বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ পেয়েছিল, যেমন - নালন্দা, বিক্রমশীলা, বল্লভী প্রভৃতি, সেই সব স্থানে শ্রেনী শিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। তবে এসব সত্ত্বেও সাধারণ ভাবে বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যাক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষণ প্রথা লোপ পায়নি, কারণ প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একজন আচার্যের

অধীনে থাকতে হত।

শিক্ষক বা আচার্য

বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায়, ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায় মত শিক্ষক বা গুরুর প্রাধান্য ছিল। বিনয়পিটক থেকে জানা যায়, শ্রমণকে একজন উপাধ্যায় বেছে নিতে হত। প্রব্রজ্যা অনুষ্ঠানের সময় শ্রমণকে একজন উপাধ্যয়ায় বেছে নিতে হত। প্রব্রজ্যা অনুষ্ঠানের সময় শ্রমণকে এই কাজ করতে হত। উত্তরীয় দিয়ে নিজে কাঁধ ঢেকে শ্রমণ তার নির্বাচিত উপাধ্যায়কে হাত জোড় করে তিন বার বলতো - "প্রভু আপনি আমার উপাধ্যায় হউন।" গুরু সম্মতি প্রকাশ করলেই তাদের মধ্যে গুরুশিষ্যের সম্পর্ক স্থাপিত হত। এই সময় থেকে শিষ্যের ধর্মীয় ও নৈতিক জীবণ গড়ে তোলবার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে উপাধ্যায় গ্রহণ করতেন। ও শিষ্যের আধ্যেত্মিক ও উন্নতির জন্য তিনি কঠোর ভাবে শ্রমণের জীবণ নিয়ন্ত্রন করতেন। শিষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তিনি কঠোরভাবে শ্রমণের জীবন নিয়ন্ত্রন করতেন। গুরুর কর্তব্য ছিল শিষ্যকে উপোদেশ দেওয়া, প্রশ্ন করা এবং তার কর্তব্য নির্দেশ করা। ওশিষ্য সঙ্ঘের অনুশাসন গুলি ঠিকমত মেনে চলছে কিনা, সে সম্পর্কে দৃষ্টি রাখা ও গুরুর কর্তব্য ছিল। শ্রমণের ভিক্ষাপাত্র পরিধেয় বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে দেওয়ার দায়িত্ব ছিল গুরুর। শিষ্য অসুস্থ হলে গুরুকেই তার শুশ্রুষা ও পরিচর্যা করতে হত। গুরু যদি মনে করতেন, শিষ্য সঙ্ঘের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয় বা ধর্ম সম্পর্কে বিশ্বাসী নয়, সঙ্ঘের নিয়মকানুন মেনে চলেছে না, তা হলে তিনি শিষ্যকে সঙ্ঘচ্যুত করতে পারতেন। বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় গুরুর প্রাধান্য থাকলে ও ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায় বন্যায় তিনি সব কিছু প্রশ্নের উর্ধ্বে ছিলেন না। গুরুকে আদর্শ চরিত্রের অধিকারী হতে হত। আর এ বিষয়ে তদারকির দায়িত্ব থাকত শিক্ষার্থীর উপর। প্রত্যেক শ্রমণকে তার গুরুর জীবনে কোন বিভ্রান্তি দেখা দিলে, বা কোন ধর্মীয় সংকট উপস্থিতি হলে, শিষ্যকেই তার প্রতিবিধানে ব্যবস্থা করতে হত। গুরু রাগ করলে বা কোন বিষয়ে অপ্রসন্ন হলে শিষ্যকেই তাকে শান্ত করার দায়িত্ব নিতে হত। গুরু যদি সঙ্ঘের আদর্শবিরোধী কোন কাজ করতেন, সেক্ষেত্রে গুরুর সেই পতনের কথা সঙ্ঘের গোচরে এনে, প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করতে হত। সঙ্ঘ থেকে কোন কঠোর বিধান গুরুর উপর আরোপ করা হলে, তার কঠোরতা লাঘব করার জন্য শিষ্যকেই সঙ্ঘের কাছে আবেদন করতে হত। প্রায়শ্চিত্ত শেষে গুরুকে পুনঃ প্রতিষ্ঠাচর দায়িত্ব শ্রমনকেই নিতে হত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বৌদ্ধশিক্ষায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ছিল পারস্পারিক নির্ভরশীলতার। এই ব্যবস্থা থেকে অনুমান করা যায়, বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার মূলে একটি প্রচ্ছন্ন ধারনা ছিল যে, মানুষের জ্ঞানমূলক বিকাশ, স্বতঃশ্চলভাবে নৈতিক ও চারিত্রিক বিকাশ ঘটাতে পারে না। যে পর্যন্ত না জ্ঞান উপলব্ধি ও বিশ্বাসের স্তরে উন্নতি হয়, সে পর্যন্ত নৈতিক ও চারিত্রিক বিকাশ সম্ভব নয়। তাই বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় উপাধ্যায়দের মত মহাজ্ঞানীদের ও শিষ্যেদর তত্ত্বাবধনে থাকার বিধান ছিল।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

মূল্যায়ন ও উপাধি দান

বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় মূল্যায়ন ও উপাধি প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, বৌদ্ধসঙ্গে শিক্ষা বিভিন্ন পর্যায়ে পরিচালিত হত। যেমন - প্রব্রজ্যা, উপসম্পদা, উপাধ্যায় ইত্যাদি। এই এক স্তর থেকে অন্য স্তর থেকে অন্যানস্তর উন্নীত হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীকে একটি ভিক্ষুমন্ডলীর উপযুক্ত বিবেচনা করলে তবেই শিক্ষার্থীকে উচ্চবর্তী স্তরে উন্নীত করা হত। এইভাবে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হত। প্রশ্নোত্তর ও মৌখিক আলোচনাকে মূল্যায়ন কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা হত। বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় উপাধি প্রদান ও এই মূল্যায়নের ভিত্তিতে হত। বারো বছর কাল গুরুর অধিনে শিক্ষা লাভের পর, মূল্যায়নের ভিত্তিতে শ্রমণকে উপসম্পদা উপাধি প্রদান করা হত। এই সময় থেকে শ্রমণরা ভিক্ষু হিসাবে বিবেচিত হতেন এবং বৌদ্ধ সঙ্ঘের সদস্য হিসেবে বিবেচিত হতেন। সাধারন ভিক্ষুদের জন্য উপসম্পাদই শিক্ষার সর্বশেষে স্তর হিসেবে বিবেচিত হত। পরবর্তী পর্যায়ে ব্যাক্তিগত প্রচেষ্টায় কোন কোন ভিক্ষু উপোধ্যায় অথবা আচার্যের স্তরে উন্নীত হতেন, তাঁদের জ্ঞানের গভীরতা বিচারে। যে সব শিক্ষার্থীরা ভিক্ষু জীবনে আগ্রহী ছিলেন না, তাদেরও অন্তত পক্ষে পাঁচ বছর গুরুর কাছে শিক্ষাগ্রহণ করতে হত। এই ব্যবস্থা গৃহী শিক্ষার্থীদের পক্ষে সুবিধাজনক ছিল। এমনকি বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরও শিক্ষান্তে গৃহী জীবনে ফিরে যাওয়ার কোন বাধা ছিল না।

বৌদ্ধশিক্ষা প্রতিষ্ঠান

প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠাননের উল্লেখ পাওয়া যায় এদের মধ্যে বৌদ্ধ অন্যতম শিক্ষালয় গুলি হল - নালন্দা ও বিক্রম শিলা। নিম্নে এগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল -

নালন্দা :

বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় বিহার গুলিই ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বহু ক্ষুদ্র বিহারের উদ্ভব হলেও রাজ্যনুকূল বর্ধিত বৃহদাকারারে বিহারগুলিই ছিল বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ নিদর্শণ। বহু শিক্ষক ও ছাত্রের সমাবেশে যৌথ পরিচালনায় সংবিধান সম্মত পন্থায় যেসব বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি হয়েছিল তার মধ্যে নালন্দার খ্যাতিই ছিল সর্বাধিক।

রাজগীরির ৭ মাইল উত্তরে রয়েছে নালন্দার ধ্বংসাবশেষ। বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থাদিতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখ আছে। নালন্দাকে সরিপুত্তর জন্মস্থান বলে তারানাথ নির্দেশ করেছেন। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিয়েছেন হিউয়েন সাঙ। সম্রাট অশোক নির্মিত বিহারকে অবলম্বন করেই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা।

নালন্দা নামকরণ সম্বন্ধে বহু প্রবাদ প্রচলিত আছে। কেউ বলেন নাল নামক গ্রামের নামে, কেউ বলছেন সর্পস্কূল পদ্মদীঘির নামে এর নামকরণ। জাতকে লিখিত

বুৎপত্তিগত অর্থটিই অবশ্য বেশী গ্রহণযোগ্য। ন + আলম + দা অর্থাৎ 'দানে যার অরুচি নেই' এই ভাবগত অর্থেই নালন্দার প্রকৃত পরিচয়।

সম্রাট অশোকের যুগে প্রথমিক সূচনা হলেও নালন্দা প্রখ্যাত হয় মহাযান বৌদ্ধ মতের জয়যাত্রাকালে। হিউয়েন সাঙ এর বিবরণে এই ক্রমবিকাশের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রথমত পাঁচশত শ্রেষ্ঠীর দানে গঠিত এই বিহার গুপ্তযুগ অতিক্রম করে হর্ষবর্ধনের যুগ, এমনকি পাল যুগ পর্যন্ত কয়েক শতাব্দী ধরে রাজানুকূল্যে বিশালায়তন হয়ে ওঠে। প্রাচীর বেষ্টিত বিহার এলাকার মধ্যেই আই সিঙ সংখ্যারাম ব্যাতীত ২০০ খানি গ্রাম দেখেছেন।

টিপ্পনী

সে যুগের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে রয়েছে নালন্দার মনোরম পরিবেশের কথা। সুউচ্চ পরিবেষ্টনী প্রাচীরের মধ্যে দ্বারদেশ থেকে প্রশস্ত পথ গিয়েছে বিদ্যালয় গৃহ পর্যন্ত। চারিদিকে বিরাটাকার বহুতল অট্টালিকা আর মেঘস্পর্শী মঠচূড়া। উচ্চতম তলের কক্ষগুলি মেঘস্তরের উর্ধ্বে। আর মাটিতে গভীর সোনালী রংয়ের ফুলের মধ্যে ইতস্তত পদ্মদীঘি। কিন্তু বাইরের এই জাঁকজমকের ঠিক উল্টো ছিল বিহারের মধ্যে শিক্ষক শিক্ষার্থীর জীবনযাত্রা। শিক্ষা ছিল অবৈতনিক। জীবনধারনের চারটি মৌল প্রয়োজন খাদ্য, বস্ত্র, শয্যা ও ঔষধ বিনামূল্যে দেওয়া হত। হিউয়েন সাঙ - এর অভিজ্ঞতা অনুসারে নালন্দার শিক্ষার্থীরা বিনামূল্যে পেতেন ২২০টি জম্বীর, ২০ টি জায়ফল, মহাসালী চাউল, দুধ, ঘি, মাখন ইত্যাদি।

বৌদ্ধ ভারতের পীঠস্থান, আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্র নালন্দায় ছিল স্নাতকোত্তর বিশেষীকরণের শিক্ষা। ভর্তির বয়স ছিল ২০ বৎসর। ১৫ বছরের ও ভর্তি করা হত, তবে সে ক্ষেত্রে ৫ বছর লাগত বিশেষ প্রস্তুতি পাঠের জন্য। উচ্চমানে শিক্ষায় প্রবেশাধিকার ছিল নিয়ন্ত্রিত। দ্বার পন্ডিতের কাছে কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হত। প্রবেশচ্ছুদের মাত্র শতকরা ২০ ভাগ প্রবেশাধিকার পেত। তবুও সমগ্র ভারত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং বর্হিভারত থেকে শিক্ষার্থীর স্রোত বইত। ছাত্রাভাব ঘটত না। উচ্চমানের তাত্ত্বিক ও নৈতিক শিক্ষা ছিল বলেই নালন্দার ছাত্র উত্তর জীবনে সুখ্যাতি অর্জণ করত। ১৫০০ শিক্ষক ৮৫০০ ছাত্রকে ১০০টি বিষয়ে বিভিন্ন পাঠকক্ষে ঘুমের সময় ছাড়া দিনে-রাতে সময় নির্ঘন্ট অনুসারে পড়াতেন।

নালন্দার পাঠক্রম গঠিত হয়ছিল ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ, ধর্মীয় - লৌকিক, দার্শনিক ও ব্যবহারিক, বিজ্ঞানও কলা প্রভৃতি সকল জ্ঞানের সমন্বয়ে। পাঠক্রমে স্থান পেয়েছিল। চতুর্বেদ, বৌদ্ধ শাস্ত্র, বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্ব, হেতু, চিকিৎসা ও শব্দবিদ্যা, ভাষা তত্ত্ব, আইন, জ্যোর্তিবিজ্ঞান, সংখ্যা, সংস্কৃত ও পানিনি প্রভৃতি। শিক্ষণ পদ্ধতিতে আলোচনা ও বিতর্কই প্রধান হওয়া সত্ত্বেও লেখা এবং পুঁথির অনুলিপি তৈরী করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হত। স্বাধ্যায়কে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত। এজন্যই তিনটি বৃহৎ অট্টালিকায় প্রতিষ্ঠিত ছিল তিনটি সুবৃহৎ গ্রন্থাকগার - রত্নসাগর, রত্নদধি এবং রত্ন রঞ্জক।

টিপ্পনী

নালন্দার শিক্ষা ছিল মূলত ধর্মভিত্তিক কিন্তু ততদিনে বৌদ্ধধর্মের রূপান্তর ঘটেছে। মহাযানের উত্থান হয়েছে। নানা গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে, হিন্দুধর্মের প্রভাবও পড়েছে। নতুন ধর্মকল্পনার বাহন রূপে ভাষ্কর্যের উন্নতি ঘটেছে। ভারতের বিখ্যাত শিল্পী বীটপাল ও ধীমান নালন্দারও শুল্পী ছিলেন। পালযুগের নতুন কলা চৈতন্য নালন্দাকে প্রভাবিত করে। সুতরাং নালন্দার শিক্ষা কেবল তত্ত্বগত নয়, সৃজনশীল ও ছিল বটে। পন্ডিত ও গবেষকদের রচনাকে অবলম্বন করে নালন্দার নিজস্ব সাহিত্য কীর্তীও রচিত হয়েছিল। তক্ষশিলার মত নালন্দা ও ছিল শিক্ষকদের খ্যাতিতে গৌরবন্বিত অন্যান্য বহুর মধ্যে ধর্মপ্রাণ, গুনমতি, জীনমিত্র এবং শীলভদ্রের কথা হিউয়েন সাঙ বলেছেন। পান্ডিত্য ও দায়িত্ব অনুসারে বিভিন্ন উপাধি ছিল। বিহার প্রধান ছিলেন'কুলপতি'। কিন্তু বিহার জীবন ছিল গণতান্ত্রিক। ছাত্রদের নিয়মানুবর্তিতার প্রশ্ন ছাত্ররাই সমাধান করতেন। তাই সাতশত বছরের গৌরবময় ইতিহাসে কোন ছাত্র বিক্ষোভ হয়নি। বস্তুত বিভিন্ন মতাদর্শ, গোষ্ঠী এবং বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে সমন্বয়ী যৌথ জীবনের সাফল্যই শ্রেষ্ঠ গৌরব।

এই সমন্বয়ী রূপই আকর্ষন করেছিল বহির্ভারতকে। চীন থেকে এসেছিলেন ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ, তাও হি, আই সিঙ; কোরিয়া থেকে তাও সিং, তাও লিঙ। শিক্ষার্থী এসেছিলেন সিংহল, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, তিব্বত থেকে। এই আন্তর্জাতিকতার প্রেরণাতেই নালন্দার পন্ডিত কুমারজীব, গুনবর্ধন, পরমার্থ প্রমুখ ব্যাক্তিরা ধর্মযাত্রায় গিয়েছিলেন চীন, তিব্বত ও অন্যান্য দেশে। শিক্ষায় এই আন্তর্জাতিকতার আবেদনটি আজও কাম্য।

'আই সিঙ' এর ভ্রমণকালেও নালন্দার গৌরব ছিল। কিন্তু তিব্বত ও গৌড় রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও অষ্টম শতকের শেষ ভাগ থেকেই গৌরব স্তিমিত হতে থাকে। পাল রাজত্বের শেষে নালন্দার গৌরব ও শেষ হয়। গোষ্ঠী সংঘর্ষ ও অন্তদ্বন্দ্বে নালন্দার আভ্যন্তরীন জীবন যখন ক্ষয়িষ্ণু, তখনই আসে বখতিয়ার খলজীর অভিযান। মুসলিম আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে নালন্দার ইতিহাসও শেষ হয়।

বিক্রমশিলা

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
28

বিক্রমশিলা মহাবিহার ছিল পাল সম্রাটদের অবদান এবং তাঁদের আনুকূল্য পুষ্ট। সম্রাট ধর্মপাল উত্তর বিহারে গঙ্গাতীরে এই 'বিহার' তৈরী করেন। বিহারটি কোথায় ছিল সে-সম্বন্ধে মতদ্বৈধ রয়েছে। কেউ বলেন এটি ছিল নালন্দার কাছে, কেউ বলেন ভাগলপুর জেলায়। সুগঠিত প্রাচীর বেষ্টনীর কেন্দ্রস্থলে ছিল মহাবোধি মূর্তি শোভিত মঠ। কেন্দ্রিয় মঠকে বেষ্টন করে ছিল ৫৩ টি ক্ষুদ্রতর মঠ এবং আরও ৫৪টি অট্টালিকা মোট ১০৮টি মঠ নিয়ে গঠিত বিহারে ছিলেন ১০৮ জন মাঠাধ্যক্ষ এবং আচার্য, উপাচার্য, উপাধ্যায়, কর্মপরিদর্শক প্রভৃতি কর্মকর্তা। সমগ্র বিহারের কর্তৃত্ব ছিল শিক্ষক মন্ডলী নিয়ে গঠিত পরিচালক সভার হাতে। এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য যে শ্রেষ্ঠ পাল সম্রাটরা যুগপৎ নালন্দা ওবিক্রমশিলার পৃষ্টপোষক ছিলেন। ধর্মপাল

উভয়েরই আচার্য ছিলেন। অনুমান করা হয় যে বিক্রমশিলার পরিচালকরা নালন্দাকে ও পরিচালনা করতেন। দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক বিনিময় হত। দীপংকর শ্রীজ্ঞান এবং অভয়কর গুপ্ত দু-জায়গাতেই অধ্যাপনা করেছেন।

বিক্রমশিলায় ছিল ছয়টি মহাবিদ্যালয় এর প্রতিটিতে ছিলেন ১০৮ জন করে শিক্ষক। মধ্যস্থলে ছিল ওদান ভবন। ছয়টি মহাবিদ্যালয়ের দিকে জ্ঞানভবনের ছিল ছয়টি দরজা। ছয়টি দ্বার রক্ষা করতেন ছয়জন দ্বার পন্ডিত। প্রধান প্রবেশ পথের দুপাশে অঙ্কিত ছিল নাগার্জুন এবং অতীশ দীপঙ্করের চিত্র। সর্বাপেক্ষা প্রাজ্ঞ ব্যাক্তিই হতেন বিহারের কুলপতি। ধর্মপালের সময় কুলপতি ছিলেন বুদ্ধজ্ঞান পাদ। এখানকার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান কুলপতি অবশ্য ছিলেন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ।

টিপ্পনী

বিক্রমশিলার পাঠক্রম কিংবা বিধিবিধান প্রত্যক্ষভাবে জানা যায় না, কারণ এই বিহার ধ্বংসের সময় সব প্রমাণই বিনষ্ট হয়। তবে নালন্দার সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক থেকে অনুমান করা চলে যে এখানেও নালন্দার মত পাঠক্রম ও নিয়মবিধি প্রচলিত ছিল। তবে পাল রাজত্বের শেষভাগে যে তান্ত্রিক বৌদ্ধ মতবাদের প্রসার ঘটে, তার দ্বারা বিক্রমশিলার ও প্রভাবিত হওয়া স্বাভাবিক।

বিক্রমশিলারও গৌরব ছিলেন এখানকার পন্ডিতরা। জ্ঞানপাদ, প্রভাকরমতি, জ্ঞানশ্রীমিত্র, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের পরিচয়েই এ বিহারের পরিচয় তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রসারে এঁদের ভূমিকা আজও তিব্বতবাসী সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করে।

কিন্তু নালন্দারই মত বিক্রমশিলাতেও এল ধ্বংসের তান্ডব। তাবাকাৎ -ই নাসারীতেই বিবৃত রয়েছে যে প্রাচীর বেষ্টিত এই বিহারকে নগরদূর্গ মনে করে বিজয়ী মুসলমান সেনাবাহিনী একে ধূলিসাৎ করে এবং অধিবাসীদের সকলকেই হত্যা করে। যে দু - একজন আত্মরক্ষা করেছিলেন তাঁরা তিব্বতের পথে পালিয়ে যান। ধ্বংসের মধ্যে ও যে বইগুলি রক্ষা পেয়েছিল আর পাঠোদ্ধার করতে পারেন এমন কাউকেই বিহারে দেখা গেল না। গ্রন্থের মর্মার্থ উদ্ধার করার পরে বিজয়ী নায়করা জানালেন যে তাঁরা যা ধ্বংস করেছেন ; তা ছিল এক বিশ্ববিদ্যালয়। বিক্রমশিলা ধ্বংস হল ; কিন্তু বিক্রমশিলার পরিচয় রইল তিব্বতের ইতিহাসে।

অনুশীলনী

নিজস্ব অগ্রগতির বিচারকরণ

১। প্রবজ্যা বলতে কী বোঝ ?

২। বিক্রমশীলার দুজন শিক্ষকের নাম লেখ।

৩। বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর শিক্ষারম্ভের সময়কাল কত ছিল।

৪। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগার সম্পর্কে যা জান বল।

৫। বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবথা ধ্বংসের দুটি কারণ উল্লেখ কর।

টিপ্পনী

মুসলিম শিক্ষা

নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্যাবলী

শিক্ষার্থীরা এই অধ্যায়ের শেষে-

(১) মুসলিমশিক্ষা ব্যবস্থার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে।

(২) মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্যসম্পর্কে জানতে পারবে।

(৩) মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলিত পাঠক্রম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে।

(৪) মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থার শিক্ষণ পদ্ধতি কেমন ছিল তা বলতে পারবে।

(৫) মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রচলিত অনুষ্ঠানবলী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে।

(৬) মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থায় মহিলাদের শিক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে।

টিপ্পনী

সূচনা

খ্রীষ্টীয় শতাব্দীতে সিন্ধুরাজ দাহিবের পরাজয় এবং মহম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু জয়ের মাধ্যমে ভারত প্রথম মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় । অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে আরবীয় মুসলমানেরা ভারতের পশ্চিম উপকূলে বাণীজ্য প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। বিজয়ী মুসলমানগণ এদেশে নিয়ে এলেন নতুন ভাষা, লিপি ও নতুন ধর্ম। ভারতের ইতিহাসে মুসলিম বিজয়ের পর এবং নতুন অধ্যায়ের সূচনা মুসলমান শাসক সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

ভারতের মুসলিম বিজয়ের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে এই সম্প্রদায়ের ব্যাক্তিগন সংঘবদ্ধ হয়েছিল । তারা যেখানে পড়েছে বিজজিত রাজ্যের মন্দির ধ্বংস করে সেখানে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছে। অথাৎ এই শিক্ষায় দেখা যায় মসজিদেক কেন্দ্র করে শিক্ষার প্রসার হয়েছে। এই শিক্ষার কতকগুলি দিক হল -

শিক্ষার লক্ষ্য

মুসলিম শিক্ষার কতকগুলি লক্ষ্য ছিল যে গুলি নিম্নে পরপর আলোচনা করা হল -

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

31

(ক) জ্ঞানেরপ্রসার :

এই শিক্ষার গুরুত্বপূর্ন লক্ষ ছিল অনুগামী মুসলমানদের মধ্যে জ্ঞান ও সত্যের সম্প্রসারনের হজরত মহম্মদ বলতেন "জ্ঞানী মানুষকে সত্য - মিথ্য, ধর্ম - অধর্ম, ভাল -মন্দ, প্রভৃতি বিচারে সক্ষমতা দান করে। তাই প্রত্যেকের জ্ঞানার্জণ করাই হল একান্ত কতব্য।"

টিপ্পনী

(খ)ইসলামধর্ম প্রচার:

শিক্ষার দ্বিতীয়লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হল ইসলামধর্ম প্রচার করা । যে কোন মুসলমানের এটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্যশিক্ষার মাধ্যমেভারতে ইসলাম ধর্ম সর্বাধিক প্রচারিত হয়।

(গ) বৈশায়িক উন্নয়ন

মুসলিম শাসকদের বৈশয়িক উন্নয়নের দিকে বিশেষ লক্ষ্য নির্দিষ্ট থাকত । তাই শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রবণতা বৃদ্ধির আকাঙ্খা অপেক্ষা প্রলোভনের মাত্রাবৃদ্ধির বিশেষ দুর্বলতা ছিল।

(ঘ) মুসলিম সমাজের ঐক্যবোধ :

মুসলিম শক্ষার আরেকটি লক্ষ্য হল মুসলিম ঐক্যবোধ । ইস্লাম ধর্মে বলা হয়েছে আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যেকে সমান।

(ঙ) রাজনৈতিক সমর্থন :

রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষা ও সমর্থন আদায় করা ছিল এই শিক্ষাব্যবস্থার আংশিক লক্ষ্য।

শিক্ষাব্যবস্থা

এই শিক্ষা মূলবৈশিষ্ট্য হল এই শিক্ষা ব্যবস্থা শাসক গোষ্ঠীর ওপর নির্ভর করত । শাসক যদি বিদ্বান বা বিদ্যোৎসাহি হতেন তাহলে তিনি সাম্রাজ্যেরশিক্ষা প্রসারে যথেষ্ট যত্নবান হতেন । শাসকদের বদান্নতায় মধ্যযুগের শিক্ষা গতিশীল ও জীবন্ত হয়েছে আবার তাদের অবহেলায় শিক্ষা হয়েছে মুমুর্শ।

মক্তব

মুসলিম শিক্ষার প্রাথমিক শক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে বলা হত মক্তব। ইহা কোন না কোন মসজিদের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বাদশাহ আকবরের সময় মক্তব গুলি পাঠশালার ন্যায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল । অনেক হিন্দুর ছেলে মেয়ে মক্তবে ভর্তি হত । এক একজন মৌলবীর অধিনে মক্তব গুলি পরিচালিত হত । প্রত্যেকটি গ্রামে একটি করে মক্তব স্থাপিত হয়েছিল। শহর গুলিতে এই মক্তবের সংখ্যা ছিল বেশী। অর্থাৎ মক্তব ছিল মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে জনশিক্ষা বিস্তারের মাধ্যম।

মাদ্রাসা

উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল মাদ্রাসা। মাদ্রাসা গুলি সাধারণত মসজিদের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। এই মাদ্রাসা ছিল কলেজের সমর্পয় প্রায় প্রত্যেক বড় শহরে একটি বেশী

মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত ছিল। দিল্লী, আগ্রা, ফতেপুর সিক্রি, জৈনপুর, শিয়ালকোট, লাহোর, এলাহাবাদ, গোয়ালিয়র, থানেশ্বর, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে ইস্লামী শিক্ষার বড় কেন্দ্র ছিল। এছাড়া বাংলাদেশ, গৌড়, পান্ডুয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে অনেক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

বিদ্যারম্ভ

হিন্দুদের যেমন বিদ্যারম্ভ কিংবা হাতেখরি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিদ্যারম্ভ শুরু হত তেমনি মুসলমানদের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিক্ষা শুরু হত। শিশুর বয়স যখন ৪ বছর ৪ মাস ৪ দিন তখন তাকে রঙিন বেশ পরিয়ে মক্তবের শিক্ষক আখেজ্জির সামনে বসান হত। শিক্ষার্থীর হাতে দেওয়া হত রৌপ নির্মিত ফলক, তারওপর লেখা থাকত কোরানের একটি অংশ আখেজ্জি এটি উচ্চারন করে শোনাতেন।

টিপ্পনী

পাঠক্রম

মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থায় মক্তব ও মাদ্রাসার জন্য পৃথক পাঠক্রম প্রচলিত ছিল।

(ক) মক্তবের পাঠক্রম :

এখানকার পাঠক্রম ছিল। লিখন, পঠন কোরানের বয়ান মুখস্থ করা ইত্যাদি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে গণিত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। কোরাণ ধর্মের নির্দেশ মেনে চলার শিক্ষাই ছিল মক্তবের প্রাথমিক পাঠ। এই পর্যায়ে উচ্চস্তরে পড়ানো হত দরবেশ ও পীরপয়গম্বরদের জীবনী, এছাড়া ফার্সী কাব্যগাঁথা, নামাজ পাঠ ধর্মীয় শিক্ষা প্রভৃতি দেওয়া হত।

(খ) মাদ্রাসার পাঠক্রম

মাদ্রাসার পাঠ বিষয় এক ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন পাঠবিষয় নির্বাচন করে নিত। মোঘল যুগেই মাদ্রাসার পাঠক্রম ছিল ব্যাপক। এখানে ব্যাকরণ, আইন চিকিৎসা, তর্কবিদা, প্রকৃতি বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত আকবরের সময়ে মাদ্রাসা পাঠক্রমের পরিধি আরও বিস্তৃত ও ব্যাপক ছিল। এই সময়ে গণিত, জ্যামিতি হিসাব, কৃষি, জমি জরিফ, অর্থনীতি, রাজনীতি, ইতিহাস, জ্যোর্তিবিদ্যা, দেহবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত। কোন কোন মাদ্রাসায় ধর্মতত্ত্ব ও কোরানের ওপর বেশী জোর দেওয়া হত।

শিক্ষণ পদ্ধতি

মক্তব্যের শিক্ষা পদ্ধতি ছিল মৌখিক। পড়া মুখস্থ করানোই প্রধান কাজ ছিল। আকবর চেয়েছিলেন যান্ত্রিক শিক্ষার পদ্ধতির পরিবর্তে একটি গতিশীল শিক্ষা ববস্থা

প্রবর্তন করা। তিনি পড়ার আগে হিন্দু শিক্ষা পদ্ধতির মত লেখা পদ্ধতির উপর জোর দিয়েছিলেন । তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন ছাত্ররা যথা সম্ভব স্বাধীনভাবে শিক্ষা লাভ করবে। শিক্ষকরা কেবল মাত্র তাদের সাহায্য করবেন তবে না বুঝে পড়া চলবে না।

পরীক্ষা পদ্ধতি

টিপ্পনী

মধ্যযুগীয় মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষর্থীদের মাঝে মাঝে বিতর্ক সভার মাধ্যমে যোগ্যতার পরীক্ষা হত। বর্তমান কালের মত ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা দানের রীতি ছিল না। পরীক্ষার পুরস্কার স্বরূপ শিক্ষার্থীদের ইনাম / তংখ্যা/ বকশিস্ প্রভৃতি দেওয়া হত । পরীক্ষা পদ্ধতি ছিল মূলত মৌখিক প্রকৃতির । তবে ফার্সী ও উর্দু ভাষাতে পারদর্শিতা দেখাতে হত।

শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্ক

মুসলিম যুগের শিক্ষকদের উচ্চসামাজিক মর্যাদা ছিল । শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সম্পর্ক ছিল প্রীতিপূর্ন । সম্রাট মহম্মদ বিন তুঘলক ফিরোৎসাহী মাদ্রাসাতে শিক্ষক ছাত্র একত্রে বসবাসের ব্যবস্থা করেছিলেন। যাতে শিক্ষক ছাত্রের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যমে কৃতিপূর্ণ আধ্যাত্মিক শিক্ষা হয় সে ব্যাপারে সহযোগিতা করেছিলেন । আবাসিক বিদ্যালয় প্রতিনিয়ত পারস্পরিক সানিধ্যের ফলে শিষ্যের জীবন ধারায় উপর গুরুর প্রভাব প্রতিফলিত হত। সৎ চরিত্র শিক্ষকের সাথে পিতা পুত্রের সম্পর্কের মত নৈতিক জীবন প্রবাহিত হত।

নৈতিক শিক্ষা

মুসলিম শিক্ষা মূলত ধর্ম ভিত্তিক তাই শিক্ষার্থীদের নৈতিক শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে পাঠক্রমের মধ্যে বিশেষ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। হজরত মহম্মদ ঈশ্বরের পথে শিক্ষাকে প্রকৃত শিক্ষা বলে নির্দেশ করেছিলে। তার অনুমৃত নীতি বা বাণী নৈতিক শিক্ষা রূপে প্রচলিত হত।

শিক্ষাকাল

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
34

ইস্লামিক শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যয়ে শিক্ষার স্তর গুলি বয়স নিরপেক্ষ ছিল। মেধাবী ছাত্র ছাত্রীকে অল্প কয়েক বছর মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর সুসম্পন্ন করে উচ্চস্তরে শিক্ষা লাভের জন্য ১২ বছর সময় কাটাতে হত।

বেতনদান

এই শিক্ষা ছিল বেতনহীন ও আবাসিক। সাধারণের দানের মক্তব ও মাদ্রাসা গুলি চলত। মক্তবে মৌলবীগণ পল্লীবাসীদের আচার অনুষ্ঠান ও ক্রিয়া কর্মের দায়িত্ব

পালন করে সংঙ্গীত ও প্রণামী থেকে ব্যায় নির্বাহ করতেন। পন্ডিতদের ভরণ-পোষণ বৃত্তি বেতন প্রভৃতি ক্ষেত্রে তার আর্থিক আনুকুল্য করতেন। অর্থাৎ এই শিক্ষা ছিল রাজানুমূল্য বা শাসক পরিচালিত।

উচ্চশিক্ষা

মুসলিম যুগে উচ্চশিক্ষার মূল কেন্দ্র ছিল বিভিন্ন রাজ্যের রাজধানী, গুরুত্বপূর্ণ নগর, শহর, প্রভৃতি স্থান। মক্তব মাদ্রাসার শিক্ষা ছাড়াও মুসলিম পরিবারে গৃহশিক্ষক রূপে আখেজি রেখে পড়বার ব্যবস্থা ছিল। ইসলামীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় সর্দার পৌর প্রথা প্রচলিত ছিল।

টিপ্পনী

নারীশিক্ষা

মুসলমান আমলে নারীশিক্ষার বিশেষ কোন উন্নতি হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষায় কিছু ব্যবস্থা থাকলেও তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। রাজ পরিবার ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহলাদের বিদ্যার সমাদর ছিল। বাবরের কণ্যা গুলবদল বেগম, হুমায়ুনের জীবনী রচনা করেন। হুমায়ুনের ভাগিনী সলিমা সুলতানা ছদ্মবেশী কবিতা লিখতেন। শাহাজাহান এর কন্যা জাহানারার আত্ম জীবনী বিখ্যাত গ্রন্থ। ঔরাঙ্গজেবের কন্যা জেবুন্নেষা বিদূষী ও সাহিত্য অনুরাগী ছিলেন।

শিক্ষার মাধ্যম

সমস্ত মধ্য যুগীয় শিক্ষা ব্যবস্থা মক্তব ও মাদ্রাসায় ভাষার মাধ্যমে ছিল ফার্সী। তবে আর্বিভাষা অবশ্য পাঠ ছিল। উচ্চ পর্যায়ে আর্বি ভাষাতে ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হত। এখানে যেহেতু কোন লিখিত পরীক্ষা হত না সেই কারণে বাধ্যতামুলক ভাষা শিক্ষার দিকটি গুরুত্ব পেত না। তবে শিক্ষার্থীকে ফার্সী ও আর্বিতে বুৎপুত্তি দেখাতে হত।

মুসলিম শিক্ষার অবদান

ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা কতকগুলি অবদান রেখেছে যেমন -

(ক) মধ্যযুগে মুসলিম শাসন কালে হিন্দু মুসলিম উভয় সাম্প্রদায়ের মধ্যে আদান প্রদান সহজতর করার জন্যই উর্দুভাষার সৃষ্টি হয়েছিল। যা এক অভিনব পদ্ধতি।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

(খ) মধ্যযুগে ইস্লামী শিক্ষার অন্যতম অবসান হল আঞ্চলিক ভাষা সমহের উৎকর্ষ সাধন।

(গ) মুসলিম আমলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করেছিল।

(ঘ)সুলতানী যুগের ইতিহাস রচনায় ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়।

(ঙ) সঙ্গীত চিত্রকলা ও স্থাপত্য শিল্পের উন্নতি ইস্লামী শিক্ষার একটি বিশেষ অবদান।

(চ) শিক্ষাক্ষেত্রে ইস্লামী শিক্ষার বড় অবদান হল সাংস্কৃতিক সমন্বয় সাধন।

টিপ্পনী

মন্তব্য

ভারতের মধ্যযুগীয় মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। তা থেকে বোঝা যায় ভারতে মুসলমান আগমণের পর এদেশে স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। মুসলিম শিক্ষার ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে ভারতীয় সংস্কৃতিকে আরও বেশী শক্তিশালী ও সহনশীল করেছে। কিন্তু মক্তবের শিক্ষা যদি শুধুমাত্র ধর্মশিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে লৌকিক শিক্ষার দিকে একটু উৎসাহিত হত তাহলে ভারতে বর্তমান নিরক্ষতার পরিসংখ্যাণ এত ভিতিপ্রদ হয়ে উঠত না।

অনুশীলনী

নিজস্ব অগ্রগতিরবিচার করণ

(ক) মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থার সূচনা কেন হয়েছিল ?

(খ)মক্তব ও মাদ্রাসা লতে কী বোঝ ?

(গ) মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থার পরীক্ষা ব্যবস্থা কেমন ছিল।

(ঘ) মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা নারীদের স্থান কেমন ছিল।

(ঙ) মুলিম শিক্ষা ব্যবস্থায় দুজন শিক্ষিত মহিলার নাম বল।

(চ) মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের কারণ কী ?

দ্বিতীয় একক

শ্রীরামপুর কলেজ ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কার্যাবলী

টিপ্পনী

নির্দেশমূলক উদ্দেশ্য :

এই অধ্যায়ের শেষে শিক্ষার্থীরা

(ক) শ্রীরামপুর মিশনের সময়কালসম্পর্কে অবগত হবে।

(খ) শ্রীরামপুর ত্রয়ী কারা সে সম্পর্কে বলতে পারবে।

(গ) শ্রীরামপুর মিশনের অন্তর্গত নারীশিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে।

(ঘ) শ্রীরামপুর ত্রয়ী এবং মিশন সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবে।

(ঙ) শ্রীরামপুর মিশনের সময়কালে বাংলা সাহিত্যের উন্নতি সম্পর্কে জানতে পারবে।

ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার সূচনা

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে মোঘল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। রাষ্ট্রীয় ভাঙ্গনের ফলে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনেতিক জীবনেও ভাঙন শুরু হয়। শিক্ষা ব্যবস্থাও পৃষ্ঠপোষকতা হারায়। দেশাব্যাপী অরাজকতার সুযোগে ইউরোপীয় বণিকগন ব্যবসা বাণিজ্য বাড়িয়ে চলে।

ইউরোপের অনেক দেশ থেকে বণিকরা ভারতে এসেছিলেন এদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে ব্যবসা বাণিজ্যগত প্রতিদন্দ্বিতা হয়েছে। অবশেষে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী অন্যান কোম্পানীকে হটিয়ে দিয়ে একচেটিয়া বানিজ্যিক অধিকার লাভ করে। বণিকের দল এসেছিল পন্যের লোভে। তাদের সঙ্গে এসেছিল খ্রীষ্টান মিশনারীর দল ধর্ম প্রচারের জন্য। মিশনারীদের চেষ্টায় শুরু হল ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের আদি পর্ব। ভারতে আধুনিকশিক্ষা ধারার প্রথম প্রবর্তক পোর্তুগীজ মিশনারী সম্প্রদায়। ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনে খ্রীষ্টান মিশনারীদের বিশেষ ভূমিকা আছে।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
37

EDUCATIONAL ACTIVITIES OF THE EARLY EUROPEANS

(১) পোর্তুগীজ মিশনারী

পোর্তুগীজরা ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম প্রবর্তক। তারা গির্জা ও মিশনের সঙ্গে যুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়, কৃষি ও শিল্প শিক্ষার জন্য অনাথালয়, উচ্চশিক্ষার জন্য

টিপ্পনী

জেসুইট কলেজ ও পাদ্রি তৈরী করার জন্য ধর্মশিক্ষার সেমিনারী এই চার রকমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল। প্রথম পোর্তুগীজ শিক্ষা ব্যবস্তাপকদের মধ্যে সেন্ট ফ্রান্সিস জোভিয়ার ও রবার্ট - ডি - নোবিলির নাম প্রধান। সেন্ট জোভিয়র ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আগমণ করেছিলেন।

পোর্তুগীজরা গোয়া, দমন, দিউ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিল। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে গোয়াতে যে জেসুইট কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় তার ভারপ্রাপ্ত 'রেক্টর' ছিলেন মাস স্টিফেন্স নামক একজন ইংরেজ। ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে সেন্ট এনস্ কনভেন্ট নামে আরেকটি কলেজ স্থাপিত । ১৬২০ ও ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে ও সালসেটে পর্তুগীজ য়ুরেসিয়ান স্কুল খোলা হয়। এ সব স্কুলগুলিতে পোর্তুগীজ ও আঞ্চলিক ও খ্রীষ্টধর্মের মূলসূত্র শেখান হত আর কলেজে তর্কশাস্ত্র, ধর্মতত্ত্ব ও ল্যাটিন প্রভৃতি পড়ান হত। জেসুইট মিশনারিরা ভারতে সর্বপ্রথম ছাপাখানা স্থাপন করেন এবং ভারতীয় ভাষা সমূহের বই ছাপান। এ সময়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে এদের পাঁচটি ছাপাখানা ছিল।

(২) ফরাসী মিশনারী

ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ফরাসী মিশনারীগণ কারিকল, পন্ডেচারি, মাহে, চন্দননগর প্রভৃতি স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করেন । ভারতীয় শিক্ষকগণের দ্বারা মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। পন্ডিচেরির মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ফরাসী ও ভারতীয় কর্মচারীদের সন্তানদের ফরাসী ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হত। এই শিক্ষা ধর্ম নির্বিশেষে বিতরণ করা হত এবং শিক্ষার মান উঁচু ছিল।

(৩) ওলন্দাজ মিশনারী

ওলন্দাজ মিশনারীরা খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে সিংহলে কাজ করেন। এরা ভারতের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন না এবং হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য আগ্রহশীল ছিলেন না, কেবল ক্যাথলিকদের প্রোটেস্ট্যান্ট করতে চাইতেন।

(৪) দিনেমার মিশনারী

দিনেমার মিশনারীরা প্রধানত ব্রিটিশের সঙ্গে যুক্ত থেকে কাজ করেন । অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে দিনেমার মিশনারীরা ভারতবর্ষে কাজ করতেন। এঁরা প্রোটেস্ট্যান্ট ছিলেন বলে অনেক সময়ে ব্রিটিশ ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানীর স্যোগিতায় ও তার এলাকায় কাজ করতেন। ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে জাইগেনবল্গ (Ziegenbalg) ও প্লুশো (Plutschau) নামক দুজন দিনেমার মিশনারীর নেতৃত্বে দক্ষিণ ভারতের ট্রানকোয়েবরে কাজ আরম্ভ হয়। এঁরা ভারতীয়দের জন্য পোর্তুগীজ ও তামিল ভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থা ও নিউ টেস্টামেন্টের তামিল ও তেলেগু অনুবাদ করিয়েছিলেন। ১৭১৩

খ্রীঃ ছাপাকানা ও ১৭১৮ খ্রীঃ শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয় খুলেছিলেন। ১৭৯৮ খ্রীঃ দুটি খ্রীষ্টান বিদ্যালয় খোলা হয়েছিল।

এঁরা সাধারণের শিক্ষার মাধ্যমরূপে তামিল ভাষায় ব্যবস্থার করতেন বলে নিজেরাও তামিল শিখতেন। জাইগেন বল্গ তামিল বাইবেল স্তবমালা' লিখেছিলেন, শুলজ তেলেগু ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করেন। উচ্চবিদ্যালয় ও শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয়ে ইংরেজী শেখান হত। মাঝে মাঝে অর্থাভাব ঘটলে এঁরা এস - পি - সি - কের কাছে অর্থ সাহায্য পেতেন। বাংলাদেশের মধ্যে শ্রীরামপুরে এঁদের প্রথম ও প্রধান প্রতিষ্ঠান ছিল। বহুদিন এ স্থানকে কেন্দ্র করে তাঁরা উত্তর ভারতে প্রচারকার্য চালাতেন।

টিপ্পনী

শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠা

১৭৯৯ সালেই ইংল্যান্ডে আর একটি ঘটনা ঘটে। ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটি আর এক জন মিশনারীকে ধর্মপ্রচারের জন্য বাংলাদেশে পাঠানো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁরা এদেশে এলে ছাড়পত্র না থাকায় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ তাঁদের কলকাতায় নামার অনুমতি দিলেন না। তখন তারা দিনেমার অধিকৃত শ্রীরামপুরে গিয়ে নামেন। দিনেমার কর্তৃপক্ষ তাঁদের সাদরে গ্রহণ করেন। এবং বসবাসের অনুমতি দেন। এই মিশনারীদের দলে ছিলেন - ডঃ জাসুয়া মার্শাম্যান (Joshua Murshan) এবং রেভারেন্ড উইলিয়াম ওয়ার্ড (William Ward)। এরপর উইলিয়াম ওয়ার্ড উত্তরবঙ্গে গিয়ে কেরীর সঙ্গে দেখা করেন এবং তাকে শ্রীরামপুরে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন। ১৮০০ সালের ১০ই জানুয়ারী উইলিয়াম কেরী শ্রীরামপুরে এসে মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের সঙ্গে মিলিত হন। ১৮০০ সালেই তাঁরা শ্রীরামপুরে একটি ছোট জায়গা কিনে তাঁদের মিশন স্থাপন করেন। তাঁদের ঐ মিশনই ইতিহাসে 'শ্রীরামপুর মিশন' নামে খ্যাত। প্রায় একই সময়ে, গর্ভণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসালী, ভারতে নব নিযুক্ত সিভিলিয়ানদের এদেশের ভাষা আইন, রিতিনীতি ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিতি করার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (নভেম্বর ১৮০০) স্থাপন করেন। কোম্পানীর নবাগত কর্মচারীরা এই কলেজে শিক্ষা গ্রহনের পর কাজে যোগদানের যোগ্যতা অর্জন করত। উইলিয়াম কেরী এই নব প্রতিষ্ঠিত কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপকের চাকরী পান ১৮০১ সালে পরে তিনি এই কলেজে সংস্কৃত ও মারাঠী অধ্যাপক হিসাবেও কাজ করেন। প্রথমে তাঁকে মাসিক ৫০০ টাকা বেতন দেওয়া হয়। পরে এই বেতন ১৮০৭ সালে ১০০০ টাকা হয়। মার্শম্যান ছিলেন সুদক্ষ শিক্ষক। তিনি একটি স্কুল স্থাপন করেন। ওয়ার্ড ছিলেন সুদক্ষ মুদ্রণশিল্পী এবং তাই ছাপাখানার কাজ পরিচালন করতেন। কেরীর নিজের বেতন, মার্শম্যানের স্কুলের ও ওয়ার্ডের ছাপাখানা আয় মিলিয়ে যে টাকা আসতো তাই দিয়ে মিশনের কাজ চালানো হত। এঁদের মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে শিক্ষাবিস্তার ও ধর্মপ্রচারের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। উনবিংশ শতাব্দীর উষাকালে। শ্রীরামপুর মিশনের কাজে এই

তিনজন মিশনারীর ভূমিকাই ছিল প্রধান। তাই তাঁদের বলা হয় "শ্রীরামপুর ত্রয়ী" (Srerampore Trio)।

শ্রীরামপুর মিশনের শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলী

মিশনের কর্মসূচী :

টিপ্পনী

শ্রীরামপুর মিশন যদিও খ্রীষ্টান মিশনারীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান ছিল, তবুও অন্যান্য মিশনের কার্যাবলীর সঙ্গে এই মিশনের কার্যাবলীর যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। মিশনারী সংস্থা হিসাবে শ্রীরামপুর মিশন খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে নেমে, দেশে শিক্ষা বিস্তারে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা আমরা চিরদিন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করতে বাধ্য। শ্রীরামপুর মিশনের কাজের বিচার ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তাঁরা ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে কি করেছেন, তা নিতান্তই গৌণ। মিশনের কাজের প্রকৃত মূল্যায়ন করতে হলে, তাঁদের শিক্ষামূলক কার্যাবলী সম্পর্কে বিশেষভাবে জানা প্রয়োজন। কেরীর সহকর্মী মার্শম্যানের লেখ "History of Sreampore Mission" বই থেকে আমরা শ্রীরমপুরের মিশনারীদের শিক্ষা প্রচার সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজ সম্পর্কে অনেক বিষয় জানতে পারি। মার্শম্যান লিখেছেন শ্রীরামপুর মিশনের শিক্ষা মূলক কর্মসূচীতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রাধান্য পেয়েছিল -

(১) মার্তৃভাষায় বিভিন্ন পাঠপুস্তক রচনা।

(২) জনশিক্ষা প্রসারের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন।

(৩) দেশীয় শিক্ষকদের শিক্ষার কাজে নিয়োগের উপযোগী করে প্রস্তুত।

(৪) ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যায়নের জন্য মাসিক পরীক্ষার ব্যবস্থা।

(৫) ছাত্র-ছাত্রী এর উৎসাহ দানের জন্য পুস্কার দানের ব্যবস্থা।

(৬) উপযুক্ত পরিদর্শকের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যের মান উন্নয়নের ব্যবস্থা।

(৭) দেশে শিক্ষা প্রসারের জন্য অর্থের সংস্থান করা।

জনশিক্ষার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
40

মিশনারীদের শিক্ষা বিস্তারের জন্য মিশনারীদের দ্বারা বিদ্যালয় স্থাপনের প্রচেষ্টাতে দেশের সাধারণ মানুষের ধর্মপ্রচারের কৌশল হিসেবে বিবেচনা করেছিল। তাই প্রথম প্রথম প্রায় ক্ষেত্রেই শিক্ষা বিস্তারের কাজে স্থানীয় অধীবাসীরা বাধার সৃষ্টি করে। পরে, অবশ্য এই অবিশ্বাসের মনোভাব দূর হয়। কেরী এবং তার সহযোগীরা দেশে জনশিক্ষা প্রসারের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করেছিলেন। তিনি নিজে মালদহে মদনাবতীতে থাকাকালীণ সেখানে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮০০ সালে শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্টিত হওয়ার পর, বিশেষতঃ

মার্শম্যনের তত্ত্বাধনে মিশন নানা স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করে। তিনি ঐ বছর শ্রীরামপুরে ইউরোপীয় ছেলে মেয়েদের জন্য দুটি আবাসিক বিদ্যলয় এবং স্থানীয় বালকদের জন্য একটি অবৈতনিক বিদ্যলয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০৪ সালে কাটোয়া ও দিনাজপুরে একটি করে এবং যশোরে ৪টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। ফলে ১৮১৭ সালের মধ্যে মিশন প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ১০৯ এবং ছাত্রসংখ্যা হয় ১৭৬৫। এই বিদ্যালয় গুলি শ্রীরামপুর, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪ পরগনা, ঢাকা, যশোর, মুর্শিদাবাদ, বীরভুম, দিনাজপুর, আজমীর প্রভৃতি স্থানে স্থাপন করা হয়। মিশনের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তদানীন্তন বড়লাট বা ভাইসরয় লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস রাজস্থানে একটি হিন্দি বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বার্ষিক ৬হাজার টাকা অনুআন মঞ্জুর করেন। ১৮১৮ সলে মিশন পরিচালিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ১১১ তে এবং এইসব বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যাও বেড়ে দাঁড়ায় ৮০৯৭ তে।

টিপ্পনী

পাঠক্রম

শ্রীরামপুর মিশন পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থায় আস্থাশীল হলেও, তাদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় গুলিতে দেশীয় শিক্ষাকে অবহেলা করেননি। তারা বুঝে ছিলেন, শিক্ষা যাই দেওয়া হইক না কেন, তা দেওয়া হবে মার্তৃভাষার মাধ্যমে। জনশিক্ষার উদ্দেশ্যে বর্ণনা করতে গিবে মার্শম্যান বলেছিলেন - "শিক্ষার্থীদের নিজের ভাষায় জ্ঞানের মাধ্যমে উন্নত করাই হবে শিক্ষার লক্ষ্য"। দেশের জনগণের সার্বিক উন্নতির জন্য যে আধুনিক বিজ্ঞানের শিক্ষার প্রয়োজন, এ কথাও মিশন উপলব্ধি করেছিলেন। তাই মিশন পরিচালিত বিদ্যালয় গুলিতে যে পাঠক্রম অনুসরণ করা হত তাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞানের সংমিশ্রণ ঘটানো হয়। এই সব বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে - (১) দেশীয় ভাষা ও তার ব্যাকরণ (২) প্রাথমিক গণন ও গণিত, (৩) জ্যোর্তিবিদ্যা, (৪)প্রাথমিক ভূগোল, (৫) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, (৬) ইতিহাস এবং (৭) নীতিশিক্ষা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়া হিন্দু ধর্মগ্রন্থ থেকে ভাল ভাল সংকলনের বই ও এইসব বিদ্যালয়ের তালিকা ভুক্ত ছিল।

পাঠপুস্তক প্রকাশ

শ্রীরামপুর মিশনে কেরী এবং তার সহযোগীরা দেশের জনশিক্ষা বিস্তারের কাজে হাত দিয়ে প্রথম যে অসুবিধার সম্মুখীন হল তা হল - দেশীয় ভাষায় উপযুক্ত পাঠপুস্তকের অভাব। তাই বিদালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা এ বিষয়েও যথেষ্ট নজর দেন। তাঁরা বিশেষভাবে ভাষা শিক্ষার প্রাথমিক বই, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, ইত্যাদি বিষয়ের বই লেখা,ছাপা ও প্রকাশের ব্যবস্থা করে। বই প্রকাশের ব্যাপারে ওপয়ার্ডের আগ্রহ এবং ভূমিকা ছিল সব থেকে বেশী। দেশীয় ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করে জনগণের মধ্যে প্রচার করার উদ্দেশ্যেই শ্রীরামপুর মিশনে ছাপাখানা স্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু ঐ কাজের সঙ্গে সঙ্গে মিশনের ছাপাখানা থেকে বাংলা ভাষার পাঠবই এবং রামায়ণ ও মহাভারত ইত্যাদি প্রকাশ থেকে প্রমাণিত হয় যে, দেশে শিক্ষা বিস্তার

করাও মিশনারীদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। আর সেই লক্ষ্য পূরণে তাদের প্রতিষ্ঠিত ছাপখানাকে তারা উপযুক্ত উপায়ে ব্যবহার করেছিলেন।

শিক্ষক শিক্ষণ

টিপ্পনী

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সথে সাথে মিশন শিক্ষাদানের কাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন ও অনুভব করেছিলেন। মিশন নীতিগতভাবে বিদ্যালয় গুলিতে দেশীয় শিক্ষক নিয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব মেটানোর জন্য শ্রীরামপুর মিশন নিজেদের তত্ত্বাবধনে ১৮১৮ সালে একটি নর্মাল স্কুল স্থাপন করেন। শিক্ষকতা কাজে যোগদানের আসে প্রত্যেক শিক্ষককে সেই নর্মাল স্কুলে প্রশিক্ষণ নিতে হত। কোন গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপনের আগে, সেই গ্রাম থেকে একজন শিক্ষক নির্বাচন করে তাকে নর্মাল স্কুলে শিক্ষা গ্রহণের জন্য পাঠানো হত। এই প্রশিক্ষণের পর সেই ব্যাক্তি গ্রামে ফিরে গিয়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজে যোগ দিত।

শিক্ষণ পদ্ধতি

মিশন তাদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় গুলিতে কি ধরণের শিক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিললেন। বেল পদ্ধতি বা সর্দার পদ্ধতি কেই মিশন নিজেদের শিক্ষার কাজে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে ও মার্শম্যান অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি নিজে প্রথমত পদ্ধতিটি আয়ত্ত করেন এবং সে নিয়ে পরীক্ষা নিরিক্ষা করেন। পরে সেটিকে একটি গ্রহণযোগ্য রূপ দেন। এই 'সর্দার পড়ুয়া পদ্ধতি বা 'মনিটরিয়াল সিস্টেম' প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতি যা বিশেষভাবে ডঃ এনড্রু এলের দৃষ্টি আকর্ষন করেছিল। এবং সেটিকে ইংল্যান্ডে রপ্তানী করা য়েছিল। মার্শম্যান সেই পদ্ধতিটিকে আবার দেশে ফিরিয়ে এনে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন বলা যায়। তিনি মনে করেন, স্বল্প ব্যায়ে গণশিক্ষা প্রসারের জন্য এই পদ্ধতি সবচেয়ে বেশী কার্যকারী হবে। তিনি প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে, প্রত্যেকটি শ্রেনীতে মনিটরের ব্যবস্থা করেন, যারা শিক্ষককে তাঁর কাজে সহায়তা করে, আংশিকভবে শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

নারীশিক্ষা

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
42

শ্রীরামপুর মিশন দেশে নারী শিক্ষা প্রসারের ব্যাপারেও একটি বিশিষ্ট ভুমিকা গ্রহণ করে। রেভারেন্ড মে চুঁচুড়ায় মেয়েদের জন্য যে বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, তাতে উৎসাহী হয়ে কলকাতার পর পর ফিমেল জুভেলাইন সোসাইটি, লেডিজ ওসাইতি ও লেডিজ অ্যাসোসিয়য়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থাগুলি কলকতায় এবং শহরাঞ্জলে নারী শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য কাজ করে। এদের প্রচেষ্টার ফলে, কলকাতায় নারী শিক্ষার প্রতি সাধারণ জনগণের অনুকূল মনোভাব গড়ে ওঠে। কিন্তু দেশের গ্রামাঞ্চলের অবস্থা তখন ও ছিল পূর্ববৎ, গ্রামাঞ্চলের মেয়েরা অজ্ঞতার গভীরে ও

হতাশার অন্ধকারে ডুবেছিল। শ্রীরামপুর মিশন দেশে নারী শিক্ষা প্রসারের জন তাই, কলকাতার বাইরে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত গ্রামাঞ্চলকে বেছে নেনে। ১৮২১ সলে ওয়ার্ডে নেতৃত্বে শ্রীরামপুরের পাশাপাশি গ্রাম গুলিতে মিশন মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হয়। ধীরে ধীরে দূরবর্তী অঞ্চলেও মিশন তাদের প্রচেষ্টা বিস্তৃত করেন। ১৮২৮ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় মিশনের প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২৮টি এবং ঐ সব বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৪৮৬ জন। এই সব বিদ্যালয়গুলি শ্রীরামপুর, বীরভূম, যশোর, ঢাকা ও চট্টোগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মিশনের বিবরণী থেকে জানা যায়, তাঁরা বাংলাদেশের বাইরেও কতকগুলি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এলাহাবাদ, বেনারস এবং ব্রহ্মদেশের আকিয়াবে একটি করে বালিকা বিদ্যালয় শ্রীরামপুর মিশনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী এক সমীক্ষায় জানা যায়, মিশন প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৩১টি এবং সেগুলিতে মোট ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৫১০ জন।

টিপ্পনী

উচ্চশিক্ষা

শ্রীরামপুর মিশনের অনতম কীর্তি হচ্ছে উচ্চশিক্ষার জন্য শ্রীরামপুরে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা। ১৮১৮ সালের ১৫ই জুলাই শ্রীরামপুর কলেজে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর এক বছর পূর্বে কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপন করা হয়েছে, যা পরে সরকারী তত্ত্বাবধনে প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তরিত হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য এবং যে সমস্ত ভারতীয় খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষীত হয়েছে তাদের শিক্ষাদানের জন্য কলেজটি প্রথম স্থাপন করা হয়। কলেজের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে মিশনের পুস্তিকায় বলা হয়েছে - "এই কলেজে ভারতীয় খ্রীষ্টান এবং অন্যান্য দেশীব যুবকদের প্রাচ্য সাহিত্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া হবে।" কলেজটি স্থাপনে শ্রীরামপুরের তদানীন্তন দিনেমার গর্ভনর মিশনকে নানাভাবে সাহায্য করেন। কেরী মার্শম্যান ও ওয়ার্ড কলেজটি একটি প্রকৃত উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার ব্যাপারে কোন ত্রুটি রাখেন নি। কলেজে ভাষা, সাহিত্য, গনিত, ভূগোল, ধর্মতত্ত্ব, আধুনিক বিজ্ঞান, জ্যোতিবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হয়। বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য উপযুক্ত যন্ত্রপাতি সহ মানমন্দির (Observatory) গড়ে তোলা হয়। এছাড়া, কলেজ একটি উন্নত ধরনের গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়।প্রথম বছর যখন কলেজটি স্থাপন করা হয় তখন কলেজের ছাত্র সংখ্যা ছিল ৪৭ জন যার মধ্যে ১৪ জন হিন্দু, ১৯ জন খ্রীষ্টান এবং অন্যান্য ছাত্র সংখ্যা ছিল ৪ জন। ১৮২৭ সালে তদানীন্তন দেনমার্কের রাজা ষষ্ট ফ্রেডরিক এক সনদ জারি করে কলেজকে ডিগ্রি প্রদানের অধিকার দান করে। ইউরোপীয় পদ্ধতি অনুসারে, এই শ্রীরামপুর কলেজই ভারতে প্রথম ডিগ্রি দেওয়ার অধিকার লাভ করে। সেই ১৮১৮ সাল থেকে আজ পর্যন্ত শ্রীরামপুর কলেজ মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে এসছে এবং একটি সুপরিচালিত কলেজ মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে এবং একটি সুপরিচালিত বেসরকারি কলেজ হিসেবে আজও পশ্চিমবঙ্গে নিজের সুনাম বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।

টিপ্পনী

শিক্ষা প্রশাসন

শ্রীরামপুর মিশনের বহুমুখী শিক্ষাকার্য কখনই বিক্ষিপ্ত ভাবে সংগঠিত হয়নি। মিশন তাদের শিক্ষা কর্মসূচী সুপরিকল্পিতভাবে বাস্তবায়িত করার দিকে বিশেষভাবে নজর দিতেন। মিশনের শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার জন্য একটি কমিটি ছিল। এই কমিটিতে কেরী, মার্শম্যান এবং ও ওয়ার্ড তিনজন সদস্য ছিলেন। তাঁদের সমবেত প্রচেষ্টায় এবং দক্ষ পরিচালনায়, ভারতে প্রথম সুসংগঠিত জনশিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনা বাস্তবরূপ লাভ করেছিল। মিশনের এই শিক্ষা কমিটি বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচন করতেন, বই ও আসবাব পত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করতেন এবং বিদ্যালয়ের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করে তার প্রশিক্ষনের (Traning) ব্যবস্থাকরতেন। এছাড়া বিদ্যালয়গুলি যোগ্যতা সম্পন্ন পরিদর্শন (Inspector) নিয়োগ করতেন। এই পরিদর্শকরা নতুন বিদ্যালয় কোথায় স্থাপন করা যেতে পারে, সে বিষয়ে কমিটিকে রিপোর্ট দিতেন এবং মিশনের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলি নিয়মিত পরিদর্শন করে, তাদের অগ্রগতি সম্পর্কে শিক্ষা কমিটিকে রিপোর্ট দিতেন।

মন্তব্য

শ্রীরামপুর মিশনের বিভিন্ন শিক্ষামূলক কার্যাবলীর এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে বোঝা যায়, এই মিশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই, দেশে জনশিক্ষার প্রসারের জন্য একটি সুসংগঠিত শিক্ষা কাঠামো গড়ে তোলা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেছিল। প্রথম পর্যায়ে শ্রীরামপুর মিশন, ব্যাপটিষ্ট মিশনের কৃপক্ষের সঙ্গে নানা কারণে মতবিরোধ হয়। তাই শ্রীরামপুর মিশন পরবর্তীকালে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে নিজের কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং সেগুলি বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট হয়। একটি মিশনারী সংস্থা হয়েও, সম্পূর্ন স্বাধীনভাবে এদেশে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিল বলেই শ্রীরামপুর মিশনের পক্ষে ভারতে এত বিস্তৃত শিক্ষাপ্রসারের আয়োজন করা সম্ভব হয়েছিল।

শ্রীরামপুর মিশনের অনান্য কার্য্যাবলী

সূচনা

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
44

শ্রীরামপুর মিশন তাদের কার্যাবলী কেবলমাত্র ধর্মপ্রচার বা দেশে জনশিক্ষা প্রচারের প্রচেষ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেনি। কেরি এবং তার সহযোগী মিশনারীগন বিশ্বাস করতেন ধর্ম, সমাজ, জীবন ও শিক্ষা একং অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এদের কোন একটিকে অবহেলা করে অপরটির বিকাশ সম্ভব নয়। তাই ধর্মপ্রচারকে কেন্দ্র করে তাদের শিক্ষা বিস্তারের কাজ শুরু হলেও, সেই শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ রুপ দেওয়ার জন্য তারা ভারতীয় সমাজের সংস্কারের দিকেও মনোনিবেশ করেন। এই উদ্দেশ্যে মিশন বহু কর্মসূচী গ্রহণ করে। ঐ কর্মসূচীগুলি পরোক্ষোভাবে শিক্ষার কাজকে

সহায়তা করে।

সংবাদপত্র প্রকাশ

ভারতে প্রথম সংবাদপত্র হিকির 'বেঙ্গল গেজেট' ১৭৮০ সালে প্রকাশিত হয়। এটি ছিল ইংরেজি সংবাদপত্র। বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশের গৌরব শ্রীরামপুর মিশনের। ১৮১৮ সালের মে মাসে মিশন থেকে 'সমাচার দর্পণ' নামে প্রথম বাংলা ভাষায় একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করা শুরু হয়। এই 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা ১৮৪০ সাল পর্যন্ত নিয়মিত প্রকাশিত হত। সদমাধানের মধ্যে সমাচার দর্পনের বিশে জনপ্রিয়তা ছিল। সমাচার দর্পনের সম্পাদক ছিলেন মার্শম্যান তাছাড়া, এই পত্রিকার সম্পাদক মন্ডলীতে জয়গোপাল তর্কলংকার, তারিনীচরণ শিরোমনি ইত্যাদির মত বিশিষ্ট বাঙালি পন্ডিতগন ছিলেন অনুমান করা হয়, সমাচার দর্পণে, লেখার ভার এইসব বাঙ্গালী পন্ডিতদের উপর ছিল। সে যুগের অনেক তথ্যই আমাদের আজ পুরাতন সমাচার দর্পনের পাতা থেকে সংগ্রহ করতে হয়। সমাচার দর্পনের পূর্বে (১৮১৮ সালের এপ্রিলে) শ্রীরামপুর মিশন থেকে, দেশের যুবকদের জন 'দিকদর্শন' নামে আর একটি মাসিক পত্রিকা বের করা হয়। এই পত্রিকায় যুবকদের অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তোলার জন্য বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করা হত। পরবর্তীকালে এই পত্রিকার একটি ইংরেজী সংস্করণ ও মিউশন থেকে প্রকাশ করা হয়। এছাড়া ইংরেজী "দ্যা ফ্রেন্ডস্ অভ্ ইন্ডিয়া" ও সমাচার দর্পণের পার্শী সংস্করণ হিসেবে 'আকবর ই শ্রীরামপুর' পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা ও মিশন থেকে করা হয়। এই প্রত্যেকটি পত্রিকা তখনকার দিনে দেশে জনশিক্ষা বিস্তারের মাধ্যম হিসাবে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা গ্রহণ করে।

সমাজ সংস্কার

উনবিংশ শতকে বাংলার নবজাগরণের একটি প্রধান লক্ষণ সমাজিক কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। শ্রীরামপুর মিশন তৎকালীন প্রত্যেকটি সমাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে জনচেতনা জাগ্রত করার ব্যাপারে সচেষ্ট হন। সতীদাহ প্রথা নিবারণের আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, শ্রীরামপুর মিশন উনবিংশ শতকের শুরু থেকেই এই বীভৎস প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল এবং এই প্রথা বন্ধ করার ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জনের মত একটি কু-প্রথা এক সময় এদেশে প্রচলিত ছিল। কেরীর রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৮০২ সালে ওয়েলেসলী এই প্রথা নিষিদ্ধ করেন। 'সমাচার দর্পণ' বিধবা বিবাহের পক্ষে অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ করে। এ বিষয়ে জনমত গঠনে মিশন সহায়তা করেন। কুষ্ঠরোগীদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার করা হত। কেরী তা বন্ধ করার জন্য চেষ্টা করেন। অনেক সমাজ বিজ্ঞানী মনে করেন, মিশনারীরা বহু সামাজিক কু-সংস্কার ও বহু ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাসের প্রতি তীব্র আক্রমণ করেছিলেন বলেই উনবিংশ শতকে হিন্দু ধর্ম সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে হিন্দু নেতারা

টিপ্পনী

সচেতন হয়ে ওঠেন এবং এক সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলেন। বাংলাদেশে সংস্কার আন্দোলনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, শ্রীরামপুর মিশন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছিলেন।

বাংলা সাহিত্যের বিকাশ

টিপ্পনী

উনবিংশ শতকের পূর্বে বাংলা গদ্যের কোন সুসংবদ্ধরূপ ছিল না। গদ্য ছিল, দলিল-দস্তাবেজ ও ব্যাক্তিগত চিঠিপত্র লেখার ভাষা। বাংলা গদ্য -রচনায় শ্রীরামপুর মিশনের অবদান অনস্বীকার্য। ১৮০০ সালে শ্রীরামপুর মিশন থেকে ছেপে কেরী অনূদিত বাইবেলের একটি অংশ "মঙ্গল সমাচার - মতীয়ের রচিত" (The Gospel according to Mathew) প্রকাশিত হয়। এটিই বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম ছাপানো বই। কেরী ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে গদ্য অধ্যাপন কালে, কলেজের পন্ডিতদের কাছ থেকে ভারতের প্রধান প্রধান ভাষাগুলি শেখেন এবং ৪০টি ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। বাইবেল অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে কেরী বাংলা, সংস্কৃত, তেলেগু, পাঞ্জাবী প্রভৃতি ভাষার অভিধান ও প্রকাশ করা হয়। বাংলা ভাষায় রামায়ন, মহাভারত, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল শ্রীরামপুর মিশন থেকেই প্রকাশিত হয়। উইলিয়াম কেরী ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপকদের সাহায্যে নিয়ে "কথোপকথোন"এবং "ইতিহাস মালা নামে দুটি বই রচনা করেন। এর মধ্যে প্রথমটি লেখা হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্রদের জন্য এর উদ্দেশ্য ছিল গ্রাম্য ও চলিত ভাষার সঙ্গে ইংরেজ সিভিলিয়নদের পরিচয় ঘটানো। দ্বিতীয়টি মূলতঃ ইতিহাস আশ্রিত কাহিনী সংকলন। এছাড়া শ্রীরামপুর মিশন দেশীয় পন্ডিতদের উৎসাহ দান করে, বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন ধারার সূচনা করেছিলেন। অবশ্য এ ব্যাপারে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভূমিকাও অনস্বীকার্য।

কৃষি সমিতি গঠন

উইলিয়াম কেরী উপলব্ধি করেছিলেন ভারতে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করতে হলে, কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে এবং কৃষিজীবি জনগনকে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান সরবরাহ করে সংগঠিত করতে হবে। মানুষের দারিদ্র্য অশিক্ষার একটি প্রধান কারণ। তাই তিনি তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড হেস্টিংসকে পৃষ্ঠপোষক হিসাবে রেখে ভারতে প্রথম এগ্রিকালচার সোসাইটি অফ্ ইন্ডিয়া (Agriculture Society of India) বা ভারতীয় কৃষি সমিতি গঠন করেন।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও ভারতীয় শিক্ষায় তার ভূমিকা

আধুনিক ভারতীয় শিক্ষা বলতে যদি আমরা পাশ্চাত্য প্রভাবিত শিক্ষাকে বুঝি তাহলে এদেশে বিদেশী মিশনারীদের শিক্ষা প্রচেষ্টা থেকেই তার সূচনা হয়েছে বলা চলে। মিশনারীরাই প্রথম ভারতীয়দের পাশ্চাত্য প্রথায় এবং পাশ্চাত্য ভাবধারায়

শিক্ষাদানের আয়োজন করেন। এদেশের জনগনকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষীত করাই যদিও তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তবু ভারতীয়দের মধ্যে থেকে অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর করে তার উন্নত জীবন যাপনে সমর্থ করার শুভ উদ্দেশ্যও যে তাদের প্রচেষ্টার অন্যতম অঙ্গ ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু মিশনারীদের প্রচেষ্টা ছাড়াও ভারতীয়শিক্ষার বিস্তারে আর একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠান বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সেটি হল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পরমায়ু স্বল্পস্থায়ী হলেও ভারতীয় শিক্ষার অগ্রগতি, বিশেষ করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে এই প্রতিষ্ঠানটির অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

টিপ্পনী

১৮০০ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে লর্ড ওয়েলেসলি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী প্রভাব সমস্ত সিভিলিয়ান কর্মচারীদের শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত এই কলেজটি গঠিত হয়। ভারতবর্ষে তৎকালীন সময়ে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বিদেশ থেকে যে সমস্ত কর্মচারী এই দেশে শিক্ষা প্রশাসনে ও পরিচালনায় নিযুক্ত ছিলেন তারা বেশীরভাগই অনভিজ্ঞ ও অপসংস্কৃতি পরায়ন। তাই ওয়েলসলি এই সব কর্মচারীদের ভারতীয়দের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভের জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত করেন।

উদ্দেশ্য

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্যে হল - ২টি। যথা -

১] সিভিলিয়ান কর্মচারীদের এদেশে শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করা।

২] ভারতীয় শাসন ব্যবস্থায় শিক্ষার বিষয়টিকে অতিমাত্রায় গুরুত্ব দেওয়া।

অধ্যাপক নিয়োগ

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সেখানে বহু অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হয়। গুণিজন অধ্যাপকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন উইলিয়াম কেরি, বার্লো, কার্লগ্রফ, বুকানন প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যাক্তিগন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক-দের পৃষ্ঠপোষকতায় এই কলেজের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়।

পাঠসূচী:

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
47

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর এখানে বাংলা ও সংস্কৃত বিষয় প্রধান ভূমিকা নিলেও ইংরেজী শিক্ষার বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া পাঠসূচীতে কয়েকটি ভারতীয় ভাষা,হিন্দু-মুশলিম আইন,আধুনিক ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় যোগ করা হয়।এছাড়া কলেজের সূচনা থেকে হিন্দী,মারাঠা,ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় পঠন পাঠন শুরু হয়।

টিপ্পনী

বাংলা বিভাগের প্রতিষ্ঠা :

শ্রীরামপুর মিশন থেকে উইলিয়াম কেরীর বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশিত এই কলেজের বংলা বিভাগের প্রধান হিসাবে যোগদান করেন প্রকাশিত হোয়ার পর লর্ড ওয়েলসলির অনুরোধে ১৮০১ সালে এই কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান হিসাবে যোগদান করেন। কেরী ছিলেন বহুভাষাবিদ্ সেই সময়ে ইংরেজ সাহেবদের শিক্ষার উপযোগী বাংলা গদ্যের বড় অভাব ছিল। সাহেবদের প্রয়োজনে কাজের ভাষা, কথাবলার ভাষা বাংলা শেখার উপযোগী গ্রন্থ রচনায় তিনি মনোনিবেশ করেন।

বাঙালী পন্ডিত নিয়োগ

উইলিয়াম কেরীর সঙ্গে সহযোগীতা করেন এদেশীয় পন্ডিতবর্গ। রামারাম বসু, গোলকনাথ শর্মা, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাজিবলোন মুখোপাধ্যায়, চন্ডীচরণ মুন্সী, কালিনাথ তর্কপঞ্চানন, রামকৃষণতর্ক চূড়ামনী, রামানাথ বাচ্সপতি, তারীনী চরণ মিত্র, হরপ্রসাদ রায়, প্রভৃতি পন্ডিতগণের সক্রিব চেষ্টায় অল্পকালের মধ্যে বাংলা গদ্য, বাংলা বিভাগ উন্নতি লাভ করে। দেশীয় পন্ডিতদের সাথে ইংরেজী তরুণদের মেলামেশা ও ভাবের আদান প্রদান বাংলায় ন যুগে সূচনা করে।

বাংলা গদ্য রচনায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অবদান

বাংলা গদ্য রচনার ক্ষেত্রে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কতকগুলি দিক থেকে বিশেষ জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন-

(১) শ্রীরামপুরের ছাপাখানর অবদান

১৮০০ সালে শুধু ফোর্ট উইলিয়াকম কলেজ স্থাপন হয়নি, শ্রীরামপুর 'মিশন প্রেস' ঐ একই বছর স্থাপিত হয়েছিল। এর ফলে ১৮০১ সালে উইল;ইয়াম কেরী রচিত বাইবেলের বাংলা অনুবাদ এবং সংবাদের বাংলা লেখার প্রয়োজনে বাংলা কথোপকথোন' বই প্রকাশিত হয়। এই সময়ে কেরী সাহেবের রচিত বাংলা ভাষার অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৮১২ সালে কেরী প্রায় ১৫০টি প্রচলিত গল্পের সংকলনে বাংলায় ইতিহাস মালা প্রকাশ করেন।

(২) সহকারীগণ কর্তৃক পুস্তক রচনা

কেরী সাহেব নিজেই বই লিখে খান্ত হয়নি। তার সহকারী পন্ডিত ও মুন্সীদের বই লিখবার জন্য তিনি নানাভাবে উৎসাহিত করেন। তার মুন্সী রামরাম বসু 'খ্রীষ্টস্তবক' এবং 'হরকরা' বই লেখেন। ১৮০১ সালে তার রচিত 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' প্রকাশিত হয় এবং পরের বছর প্রকাশিত হয় 'লিপিমালা' বাংলার লেখা প্রথম গদ্য গ্রন্থ হিসাবে 'প্রতাপাদিত্য চরিত' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(৩) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রচিত পুস্তিকাবলী

তিনি ছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পন্ডিত। তাঁর রচিত 'রাত্রির সিংহাসন', 'প্রবোধ চন্দ্রিকা', 'হিতপদেশ', 'রাজাবলী, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার 'রত্রির সিংহাসন' কলেজের পাঠপুস্তকের তালিকায় স্থান পেয়েছিল। 'রাজধানী' বাংলা গদ্যে লেখা প্রথম ঐতিহাসিক কাহিনী। তিনি কলিকাতা 'School Book Society' এর কার্যকরী কমিটির সদস্য ছিলেন। বাঘবাজারে তার নিজস্ব চতুষ্পাঠী ছিল।

টিপ্পনী

(৪) তারিনী চরণ মিত্র রচিত পুস্তিকাবলী

এই কলেজের আর একজন খ্যাতনামা পন্ডিত ছিলেন তারিণী মিত্র। তিনি Calcutta School Book Socicety' এর সম্পাদক ছিলেন তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল ৬টি Fables এর সংকলন তিনি ইংরেজী ও আর্বি থেকে আহরণ করে নীতি কথা বাংলা ভাষায় প্রকাশ করেন। তারিণী চরণ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হিন্দী বিভাগের মুন্সী ছিলেন।

(৫) অন্যান্য পন্ডিত বর্গের রচনাবলী

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অন্যান্য পন্ডিত বর্গদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হন চন্ডিচরণ মিত্রের 'তোতা ইতিহাস', রাজীবলোচন মুখপাধ্যায়ের মহারাজ 'কৃষ্ণচন্দ্র রাজস্য চরিত্রম্' মোহন প্রসদ ঠাকুরের 'ইঙ্গ বঙ্গ শব্দ ভান্ডার' হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষ পরীক্ষা' কাশিনাথ তর্ক পঞ্চাননের 'পদার্থ কোমুদী' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থগুলি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অবদান হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(৬)অনুবাদ গ্রন্থরাজি

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পন্ডিত বর্গের দ্বারা রচিত অধিকাংশ গ্রন্থ ছিল অনুবাদ গ্রন্থ। ইংরেজী, সংস্কৃত, ফার্সী প্রভৃতি ভাষায় গ্রন্থ ও উপাদান সমূহ এই গ্রন্থগুলির মূল উপজীব্য ছিল। গ্রন্থগুলির ভাষাও ছিল প্রধানত অনুবাদের ভাষাও ছিল প্রধানত অনুবাদের ভাষা। সংস্কৃত , আর্বি ফার্সী প্রভৃতি ভাষার শব্দ ইংরেজী অথবা সংস্কৃত ধাচে পাঠদান করা হত।

(৭) বাংলা গদ্য রচনায় অনুপ্রেরণা সৃষ্টি

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
49

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজেই বাংলা গদ্য রচনার প্রথম অনুপ্রেরনা সৃষ্টি হয়েছিল। শিক্ষিত বাঙালী গদ্য রচনায় প্রয়োজন ও গুরুত্ব সম্বন্ধে অণুভব করতে পেরেছিল ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়ে গ্রন্থ রচনার ঋতি এই কলোএজেই প্রথম সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞান আলোচনার পর এই কলেজের গ্রন্থ রচনার চেষ্টার দ্বারা প্রথম নির্দেশিত হয়।

টিপ্পনী

নবজাগরণের পথ প্রস্তুতি

বাংলা সাহিত্যে নবজাগরণের ক্ষেত্রে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বিভিন্ন দিক থেকে আন্দোলন শুরু করেছিল সেগুলি হল -

(ক) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে প্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষায় মূল্যবোধ ও ভাবধারর সঙ্গে প্রাচ্য শিক্ষার মূল্যবোধ ও ভাবধারার সমন্বয় ও সহাবস্থান সম্ভব হয়। এর ফলে উভয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্যে গুনগত পরিমাপের সুবিধা হয়।

(খ) দেশীয় পন্ডিত বর্গের সঙ্গে পাশ্চাত্য পন্ডিত ও তরুণদের মেলামেশা ও ভাবের আদানপ্রদান বাঙালী ভাব মানুষের নতুন আলোরনের সৃষ্টি করে। ফরাসি বিপ্লবের প্রেরণা মিল ও বেন্থামের ভাবনা এই কলেজের পরিবেশে সজীব অবস্থাব ছিল।

(গ) অপরদিকে দেশী পন্ডিতগণ উদারনৈতিক মতাদর্শের মধ্যে নিজেদের দেশীয় ভাবনা ও মতাদর্শকে হারিয়ে ফেলেননি। ধর্মের সঙ্গে উদারনৈতিক মতাদর্শ কে মিলিয়ে ফেলেননি। ফলে এই কলেজে যে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের যে ভাব সম্মেলন ঘটেছিল বৃহত্তর বাঙালী সমাজকে তা বেশ নাড়া দিয়েছিল।

(ঘ) এই কলেজের পাশ্চাত্য শিক্ষার সাথে সাথে বাংলা বিষয়বস্তুর সমন্বয় যেমন সমন্বয় হয়েছিল তেমনি দেশীয় পন্ডিতগণ ইংরেজী শেখার গুরুত্ব অনুভব করেছিলেন।

(ঙ) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পরিবেশের প্রভাবে বাঙালিদের চেষ্টায় অনেক ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এইসব স্কুলের শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী ভাষার চর্চাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল।

অবদান

এই কলেজের প্রতিষ্ঠা বাঙালী জীবনের অতি শুভ সুযোগ এনে দিয়েছিল। বাংলা গদ্যের বিকাশে, ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা প্রবর্তনে ; বিজ্ঞান চর্চার সুযোগ সৃষ্টিতে ইংরেজী শিক্ষার প্রসারে ও সর্বপরি বাংলার মানুষের নবযুগের সুচনায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অবদান অপরিসীম। তবে কলেজটির প্রভাব থেকে বাঙালী সমাজ বঞ্চিত হয়নি। মনিষী পন্ডিতগনের সমাবেশশে কলেজটি বাঙালির জীবনে নতুন পথের দিশারী হয়ে উঠেছিল। তাই বাঙালী তথা সমগ্র ভারতে শিক্ষা ও সংস্কৃতির আধুনিক ইতিহাসে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে। ইংরেজ প্রাচ্যবিদ্‌গন, শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পন্ডিতগণ বাংলা গদ্যে রূপ না দিলে উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার সংস্কৃতি ও সামাজিক পুনরুজ্জীবন সম্ভব হত না।

অনুশীলনী

১) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কি ভূমিকা পালন করেছিল ?

২) শ্রীরামপুর ত্রয়ী কারা ছিলেন ? শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রীরামপুর ত্রয়ীর অবদান আলোচনা কর।

৩) শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন। বাংলা ভাষা, সাহিত্যে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রীরামপুর মিশনের অবদান আলোচনা কর।

৪) বাংলা শিক্ষার অগ্রগতিতে শ্রীরামপুর মিশনের অবদানকে সূক্ষভাবে মূল্যায়ন কর।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

ঐতিহাসিক মেকলে মিনিট এবং সনদ আইন

টিপ্পনী

নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়ের শেষে শিক্ষার্থীরা -

১) মেকলে মিনিট সম্পর্কে জানতে পারবে।

২) প্রাচ্য পাশ্চাত্য দ্বন্দ্ব কি সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে।

৩) সনদ আইন সম্পর্কে ধারণা প্রদান করতে পারবে।

৪) GCPI গঠনের বর্ণনা দিতে সক্ষম হবে।

১৮১৩ এর সনদ আইনের সরকারী ব্যাখ্যা

১৮১৩ সালে কোম্পানীর সনদ আইনে শিক্ষাধারা গৃহীত হবার পর আশা করা গিয়েছিল, সরকারী প্রচেষ্টায় দেশে দ্রুত শিক্ষারে প্রসার লাভ ঘটবে এবং সরকার শিক্ষা সম্পর্কে একটি সাধারণ নিতি স্থির করে শিক্ষাব্যবস্থার পুর্নগঠন ও নিয়ন্ত্রণ করবে। কিন্তু দেশে শিক্ষার ব্যাপারে প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণে কোম্পানীর আপত্তি ছিল, তাই কোম্পানীর কোর্ট অভ ডাইরেক্টরস ১৮১৩ সালের আইনের ধারটিকে খোলা মনে নিতে পারেননি। তাই কোর্ট অভ ডাইরেক্টরস এক লক্ষ টাকা খরচের ব্যাপারে যে নির্দেশ বড়লাটকে দেন, তা ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি করে। সনদ আইনে, কোম্পানীকে তিনটি ব্যাপারে বরাদ্দ অর্থ খরচ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল - প্রথমত : সাহিত্যের পুনরুজ্জীবনন ও উন্নতির জন্য। দ্বিতীয়ত : শিক্ষিত ভারতীয়দের উন্নতির শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য এবং তৃতীয়ত : বিজ্ঞান শিক্ষার প্রর্তন ও উন্নয়নের জন্য। এই ধারায় উল্লিখিত ব্যায়ের ক্ষেত্রগুলির মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় ক্ষেত্রটি ছিল ব্যাখ্যা সাপেক্ষ এবং তৃতীয়ক্ষেত্রটি স্পষ্ট হলেও কোম্পানী সরকার সেটিকে পরবর্তীকালে অপপ্রয়োগ করে, জনশিক্ষা সম্পর্কে নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। আইনেরশিক্ষা ধারায় সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও উন্নতি (Reival & improvement of literature) বলতে ভারতীয় অথবা পাশ্চাত্য কোন সাহিত্যের কথা বলে হয়েছিল তা পরিষ্কার নয়। ঠিক তেমনি বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তন ও উন্নয়ন (Introduction &promotion of knowledge of science) বলতে প্রাচ্যবিজ্ঞান কি প্রাশ্চাত্য বিজ্ঞনেরকথা বলা হয়েছিল, তাও স্পষ্ট নয়। ফলে শিক্ষাধারার এই দুটি অংশের ব্যাখ্যা নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত হয়। এই আইনের নির্দেশ

টিপ্পনী

কার্যকরী করার জন ইংল্যান্ডে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট -অভ- ডাইরেক্টরস্ এক নির্দেশনামা বা ডেস্প্যাচ (Despatch) পাঠান, তাতে তাঁরা ঐ বরাদ্দ টাকা কিভাবে খরচ করতে হবে তার নির্দেশ মত। ঐ নির্দেশনামা বা ডেসপ্যাচে, প্রাচ্য দর্শন, আইন, জ্যোতির্বিদ্যা, ভেষজ বিদ্যা ইত্যাদির উপযোগিতার কথা উল্লেখ করে, সে সব বিষয়ের পুনরুজ্জীবন ও উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ অর্থ খরচ করতে বলা হয়। তা ছাড়া, কোম্পানীর ইউরোপীয় কর্মচারীরা যাতে ভারতীয় পন্ডিতদের কাছ থেকে প্রাচ্য বিদ্যা শিক্ষা করতে পারে সেইমত সুযোগ সৃষ্টির জন্য অর্থ ব্যায় করতে বলা হয়। গ্রামাঞ্চলে মাতৃভাষার মাধ্যমে যে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা ছিল, সেগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে বলা হয় এবং গ্রাম্য শিক্ষকদের অধিকার অক্ষুন্ন রাখার জন্য সব রকমের সাহায্য করতে বলা হয়। ১৮১৪ সালের এই ডেসপ্যাচে ইংরেজী শিক্ষা বা পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্পর্কে কোন নির্দেশই ছিল না। কোম্পানী কর্তৃপক্ষের ভয় ছিল পাশ্চাত্য ধাঁচে ইংরেজী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপনের চেষ্টা করলে হিন্দুরা তার বিরোধীতা করবে এবং তাতে দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়বে। তাই তাঁরা প্রাচ্য বিদ্যালয় প্রসার ও উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ অর্থব্যায় করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এইনির্দেশ আনুযায়ী তদানীন্তন বড়লাট লর্ড হেস্টিংস প্রতি জেলায় হিন্দু ও মুসলমান জন্য দুটি করে বিদ্যালয়, বিপথগামী ছেলেদের সংশোধনের জন্যএকটি করে বিদ্যালয় এবং বৃত্তিশিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু, সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। কারণ এই সময় কোম্পানী সরকার প্রথমে গুর্খাযুদ্ধ, পরে পিন্ডারী যুদ্ধ এবং তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে ভীষনভাবে বিব্রত হয়ে পড়েন। তাই ১৮১৩ সালের সনদ আইন পাশ হওয়ার পর প্রথম দশ বছর তার শিক্ষা বিষয়ক ধারাকে কার্যকরী করার জন্য বিশেষ কিছু প্রচেষ্টা করা হয়নি সামান্য কিছু কিছু অর্থ মঞ্জুর করা ছাড়া সরকারী প্রচেষ্টায় শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন করে কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। যুদ্ধের ঝামেলা মিটে যাওয়ার পর ১৮২১ সালে পুনায় একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় সরকারী উদ্যোগে। ১৮২২ সালে দেশীয় ডাক্তারদের শিক্ষার জন্য কলকাতায় একটি মেডিক্যাল স্কুল খোলা হল। কলকাতা, নবদ্বীপ এবং ত্রিহুতে সংস্কৃত কলেজ খোলার প্রস্তাব ও এই সময় করা হয়েছিল. কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি।

G.C.P.I. গঠন

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
54

অনদিকে ১৮১৩ সালের সনদ আইনের মিশনারী ধারার সুযোগ নিয়ে এবং সরকারী নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে মিশনারীরা দেশে জনশিক্ষা প্রসারের জন্য নতুন উদ্যেগে নেমে পড়েছিলেন। বেসরকারীভাবে এই মিশনারিগণ ও কিছু দেশীয় নের্তৃবর্গ নতুন নতুন বিদ্যালয় স্থাপনে এগিয়ে আসেন। ইতিমধ্যে দেশীয় জনগন ও ইংরেজী শিক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছেন। সরকার বেসরকারী প্রচেষ্টার অগ্রগতি ও ফলাফল লক্ষ্য করে বুঝলেন, তাঁদের ও কিছু করার সময় এসেছে। শিক্ষা সম্পর্কে সরকারের দীর্ঘদিনের নিষ্ক্রিয়তা দূর করলেন অস্থায়ী

বড়লাট মিঃ অ্যাডাম ১৮২৩ সালে, ৩১শে জুলাই সপরিষদ বডলাট দশজন সদস্য নিয়ে "জেনারেল কমিটি ফর পাবলিক ইনস্ট্রাকশন" (General Committee for Public Instruction) সংক্ষেপে G.C.P.I নামে একটি শিক্ষা সংক্রান্ত কমিটি গঠন করেন। এই শিক্ষা কমিটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয় - "ভারতীয়দের জন্য উন্নত ও প্রয়োজনীয় শিক্ষার প্রবর্তন এবং তাদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধনের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণ করার জন্য এই শিক্ষা কমিটি গঠন করা হয়েছে।" বাংলাদেশে কর্মরত সিভিলিয়ায়নদের নিয়ে এই শিক্ষা কমিটি গঠিত হয়। সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারপতি জন হেরিংটন এবং ডঃহোরেস উইলসন যথাক্রমে এই শিক্ষা কমিটির (G.C.P.I) প্রথম সভাপতি ও ও সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই শিক্ষা কমিটিকে সাহায্যকরার জন বিভিন্ন জায়গায় আঞ্চলিক কমিটি গঠন করা হয়। সমগ্র উত্তরভারতে কমিটির কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হয়। কমিটির হাতে শিক্ষার জন্য বরাদ্দ একলক্ষ টাকা দেওয়া হয়। এই কমিটিকে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। স্থির হয় দেশে শিক্ষা প্রসারের জন্য সরকারের হাতে বেশী অর্থ না থাকায়, কমিটি কেবলমাত্র উচ্চশিক্ষার জন্য অর্থব্যায় করবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ১৮১৩ সালের আইনের অতিপ্রয়োজনীয় প্রথম ও তৃতীয় শর্তগুলিকে বাদ দিয়ে সরকার দ্বিতীয় শর্তটির আশ্রয় গ্রহণ করেন। অর্থাৎ সরকারের বরাদ্দ টাকা কেবলমাত্র দেশীয় শিক্ষিত ব্যাক্তিদের উন্নত স্তরের শিক্ষার জন্য ব্যায় করা হবে।

টিপ্পনী

মন্তব্য

শিক্ষা কমিটি (G.C.P.I) কাজে নেমে ১৮২৪ সালে ১লা জানুয়ারী কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন। আগ্রা ও দিল্লীতেও দুটি প্রাচ্য বিদ্যার কলেজ খোলা হয়। সংস্কৃত ও আরবী বই ছেপে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া ইংরেজী বইরও অনুবাদ ছাপা হয় কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গেল বইগুলির বিশেষ কোন চাহিদা নেই। বেসরকারী শিক্ষা প্রচেষ্টার ফলে দেশে ইতিমধ্যে ইংরেজী শিক্ষা বা পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষা জনমত গড়ে উঠেছিল। ১৮২৩ সালে ১১ই ডিসেম্বর রাজা রামমোহনের মত দেশীয় নেতা লর্ড আর্মহার্স্টকে এক চিঠি লিখে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। তিনি বললেন সরকারের শিক্ষার ব্যাপারে আরো প্রগতিশীল হওয়া উচিত। তিনি সরকারী শিক্ষার ব্যাপারে আরো প্রগতিশীল হওয়া উচিত। তিনি সরকারী টাকা ব্যায়ে ভারতীয়দের আধুনিক গণিত রসায়ন, প্রকৃত দর্শন, শারীরবিদ্যা ইত্যাদি বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানান।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দ্বন্দ্ব

সূচনা

পুর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ১৮১৩ সালের সনদ আইনের শিক্ষা সংক্রান্ত ৪৩নং ধারায় ব্যাখ্যা নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয়। ঐ ধারার দুটি কথা 'সাহিত্যের উন্নতি'এবং

টিপ্পনী

'বিজ্ঞানের জ্ঞান' নিয়ে বিভ্রান্তি প্রথম থেকেই ছিল। কোম্পানী সরকার এরই সুযোগ নিয়ে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শিক্ষানীতির কথা বলতে লাগলেন, এ আমরা লক্ষ্য করেছি। সনদ আইনের তাৎপর্য ব্যাখ্যার দিক থেকে শিক্ষিত ইংরেজ সম্প্রদায় ও দেশীয় নেতৃস্থানীয় ব্যাক্তিদের মনেও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। শিক্ষা কমিটির (G.C.P.I) সদস্যদের মনে এ বিষয়ে বিভ্রান্তি ছিল , প্রথম থেকেই। কিন্তু কোম্পানী কর্তৃপক্ষের পরিবর্তণশীল মনোভাব লক্ষ্য করে স্বভাবতই তাঁরা দুটি ভাগে ভাগ হয়ে গেলেন। তাদের মধ্যেএকদলের নেতৃত্ব দিলেন প্রিন্সেপ্ এবং অপর দলের নেতৃত্ব দিলেন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ট্রেভেলিয়ান। শিক্ষা কমিটির (G.C.P.I) সদস্যের মধ্যে চারটি বিষয় নিয়ে মূলতঃ এই মতভেদ দেখা দিয়েছিল। প্রথমতঃ প্রশ্ন ওঠে কাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সরকারী অর্থ ব্যায় করা হবে। দ্বিতীয়ত, এই শিক্ষার বিষয়বস্তু কি হবে। তৃতীয়ত, শিক্ষার মাধ্যম কি হবে তা নিয়েও বিতর্ক শুরু হয় এবং চতুর্থত বেসরকারী প্রচেষ্টার ভূমিকা কি হবে এবং সরকার বেসরকারী শিক্ষা বিস্তারের উপর কতটুকু নিয়ন্ত্রন রাখবেন, এ নিয়েও মতবিরোধ হয়। এই সমস্যাগুলির সমাধান করতে গিয়ে শিক্ষা কমিটির সদস্যরা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলেন। এদেঁর এক দলকে বলা হয় প্রাচ্যবাদী (Classicsta বা Orientalist) এবং অপর দলকে বলা হয় পাশ্চাত্য বাদী (Anglicist)।

প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দ্বন্দ্বের বিভিন্ন দিক

প্রথম প্রশ্নের অর্থাৎ, কাকে শিক্ষা দেওয়া হবে সরকারী অর্থে এই প্রশ্নের সমাধান দিতে গিয়ে প্রাচ্যবাদীরা বললেন, সরকারীই অর্থ জনসাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের জন্য ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ সরকারকে দেশের বৃহত্তর জনগনের মধ্যে শিক্ষা নববিস্তারের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে । অন্যদিকে পাশ্চাত্যবাদীরা এই সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে বললেন সরকারী অর্থ দেশের উপযুক্ত ব্যাক্তিদের উচ্চশিক্ষা দানের জন্য ব্যবহার করতে হবে। দেশের সামান্য সংখ্যক ব্যাক্তিকে উন্নত জ্ঞান - বিজ্ঞান এর সঙ্গে পরিচিত করতে পারলে তারাই দেশের পক্ষে বেশী উপযোগী হয়ে উঠবে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে প্রাচ্যবাদীরা বললেন, ভারতীয়দের জন্য ভারতীয় জ্ঞান -বিজ্ঞান বা প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ সরকারী অর্থ কেবলমাত্র ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার জন্য ব্যবহার করা উচিত। অন্যদিকে, পাশ্চাত্য - বাদীরা বললেন - সনদ আইনে জ্ঞান - বিজ্ঞান বলতে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে। সুতরাং সরকারী বরাদ্দ সব অর্থই ভারতীয়দের পাশ্চাত্যের আধুনিকজ্ঞান - বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত করার জন্য ব্যবহার করাই হবে সঠিক পন্থা। তৃতীয়প্রশ্নে অর্থাৎ শিক্ষার মাধ্যম কি হবে এই প্রশ্নে দুটি দলের মধ্যে মতবিরোধ চরমে উঠে। প্রাচ্যবাদীরা দাবি করেন ভারতীয়দের জন্য শিক্ষা ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ সংস্কৃত,আরবী, ফার্সী ইত্যাদি ভাষাই হবে শিক্ষার মাধ্যম। অপরদিকে পাশ্চাত্যবাদীরা বললেন, ইংরেজীকেই ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে হবে।

কারণ ইংরেজী মাধ্যম ছাড়া পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা অর্জন করা সম্ভব নয়। এই মতবাদের সমর্থনে পাশ্চাত্য বাদীরা আরো অনেক যুক্তি উপস্থাপন করেছিলেন। যেমন - (১) তাঁর বলেছিলেন মিশনারীদের প্রচেষ্টার ফলে ভারতীয়দের কাছে ইংরেজী ভাষা ইতিমধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এবং তারা ঐ ভাষা শিখতে যথেষ্ট আগ্রহী । (২) ইংরেজী ভাষা শাসক শ্রেণীর ভাষা হওয়ার, সেই ভাষা শিখলে ভারতীয়দের চাকুরী জোগাড় করা সুবিধা হবে এবং তাদের সামাজিক মর্যাদার বৃদ্ধি পাবে। সামাজিক মর্যাদা অর্জণ ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রয়াসে ভারতীয়রা ইংরেজী ভাষা শিখতে বেশী আগ্রহী হবে। আর তাদের এই আগ্রহের দরুণ সরকারী অর্থ ব্যায়ে শিক্ষা প্রচেষ্টা সফল হবে। শিক্ষা সম্পর্কে চতুর্থ প্রশ্নেও দুটি দলের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য দেখা যায়। প্রাচ্যবাদীরা চাইছিলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারী প্রচেষ্টাগুলিকে উৎসাহ দান করা হউক । কিন্তু অপরপক্ষে পাশ্চাত্যবাদীরা চাইছিলেন বেসরকারী প্রচেষ্টা বন্ধ করতে।

টিপ্পনী

মন্তব্য :

এমনিভাবে, উনবিংশ শতকের প্রথমাংশে ঠিক সরকার যখন শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণের জন প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছেন, সে সময় শিক্ষা সম্পর্কে সরকারী নীতি নির্ধারনের ক্ষেত্রে দুটি পরস্পর বিরোধী মতবাদের সৃষ্টি হয়। শিক্ষা কমিটির দশজন সদস্যের মধ্যে পাঁচজন পাশ্চাত্য মতবাদ সমর্থন করেন এবং বাকী পাঁচজন প্রাচ্য মতবাদ সমর্থন করেন। প্রাচ্য মতবাদ যে কেবলমাত্র ভারতীয়রা সমর্থন করেছিলেন তাই নয় বহু ইংরেজও প্রাচ্য মতবাদকে সমর্থন করেছিলেন । আবার পাশ্চাত্য মতবাদও অনেক শিক্ষিত ভারতীয়রাও সমর্থন করেছিলেন। রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি মনীষিরা পাশ্চাত্য মতবাদের সমর্থক ছিলেন।

মেকলের মিনিট

সূচনা

১৮১৩ সাল নাগাদ শিক্ষক কমিটির মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাদীদের মধ্যেকার বিরোধ এমন চরম অবস্থায় পৌছায় যে, সরকারের সমস্তরকম শিক্ষামূলক কাজ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ঐ অবস্থার অবসান ঘটাতে না পারলে, শিক্ষাক্ষেত্রে সুষ্ঠু নীতি গ্রহণ করা সম্ভব হবে না, একথা কমিটির (G.C.P.I) সদস্যরাও অনুভব করছিলেন। তাই তারা কোম্পানী সরকারের দ্বারস্থ হলেন, ১৮১৩ সালের ঐ সনদ আইনের ব্যাখ্যা পাওয়ার জন্য এমত অবস্থায় ১৮৩৪ সালে লর্ড মেকলে বড়লাটের পরিষদে আইন সদস্য রূপে যোগ দেন। বড়লাট লড বেন্টিংক তাঁকে শিক্ষা কমিটির (G.C.P.I) সভাপতি হিসাবে নিযুক্ত করেন।

টিপ্পনী

মেকলেরব্যাখ্যা ও মন্তব্য

মেকলে তাঁর মিনিটে লিখলেন -(১) 'সাহিত্য' (Literature) কথাটিতে শুধুমাত্র সংস্কৃত বা আরবী সাহিত্যিকে বোঝাব না, ইংরজী সাহিত্যকে ও বোঝায়। (২) 'শিকইত ভারতীয়' (Learned native) বলতে সংস্কৃত পন্ডিত বা আরবী ফার্সীতে পারদর্শী মৌলবীকে বোঝায় না। যাঁরা লকের দর্শন বা মিলটনের কবিতার পাদর্শিতা লাভ করেছেন। তাঁদের ও বোঝায়। সুতরাং একতরফা ভাবে কোন একটি মতবাদের সপক্ষে ১৮১৩ সালের ৪৩নং ধারাটিকে ব্যখ্যা করা ঠিক হবে না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ বিষয়ে তাঁর ব্যাক্তিগত অভিমত ব্যক্ত করে বললেন - প্রাচ্য বাদিগন যে দাবি করেছেন, প্রাচ্য বিদ্যার প্রতিষ্ঠান গুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, কারণ, সেগুলি ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতীক, এই দাবির কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। কারণ ঐগুলি কোন উপকারে আসছে না, তাই সেগুলি উঠিয়ে দেওয়া উচিৎ। অর্থাৎ মেকলে পাশ্চাত্য বাদীদের পক্ষেই রায় দিলেন ।(৩) 'বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তন ও উন্নয়ন' সম্পর্কে আইনের বিশেষ ধারায় যা বলা হয়েছে, সে বিষয়ে প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য যে জ্ঞানকে বড়লাট ভাল মনে করবেন, তার জন্য তিনি সরকারী অর্থ ব্যায় করবেন। আইন তাঁকে সেই অধিকার প্রদান করেছে। অর্থাৎ বিজ্ঞান শিক্ষা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে সমস্ত দায়িত্ব মেকলে সরকারের উপর ছেড়ে দিলেন। (৪) শিক্ষার মাধ্যম সম্বন্ধে, মেকলে বিভিন্ন দলের মতামত বিচার করে, তাঁর অভিমত উপস্থাপন করেন। শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে তখন তিনটি দাবি উঠেছিল - (ক) দেশীয় ভাষা বা মতৃভাআ ; (খ) ইংরেজী ভাষা। মেকলে তাঁর মিনিটে দেশীয় ভাষা বা মার্তৃভাষাকে অত্যন্তদীন এবং ঐশ্বর্যহীন বলে, তাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রথমেই নাকচ করে দিলেন। তিনি বলেছিলেন দেশীয় ভাষাসমূহের শব্দ সম্পদ ভাব প্রকাশে এত অনুপযুক্ত যে পাশ্চাত্য ভাষা সমূহের শব্দ সম্পদ ভাব প্রকাশে এত অনুপযুক্ত যে পাশ্চাত্য ভাষায় লিখিত জ্ঞান বিজ্ঞানের বইগুলি ঐ ভাষায় অনুবাদ করা সম্ভবনা।প্রাচীন ভারতীয় ভাষাগুলির তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট এবং ভুলে ভরা। তিনি দম্ভ ভরে মন্তব্যে লিখেছিলেন-

"A Single self of a good European Library was worth of whole Native literature of India & Arabia."

অর্থাৎ, "সমস্ত ভারতে ও আরবে মিলে যে সাহিত্য সম্পদ আছে, ইউরোপীয় যে কোন একটি ভাল গ্রন্থাগারের আলমারির একটি মাত্র তাকে যে সম্পদ আছে তার সঙ্গে তুলনা করাযায়।"

পরবর্তীকালে তিনি বলেন ইংরেজী শিক্ষার ফলে, এদেশে এমন এক শ্রেনীর মানুষ সৃষ্টি হবে যারা বর্ণে ও রক্তেই ভারতীয় থাকবে, কিন্তু রুচি, মতামত, নীতি ও বুদ্ধিতে হবে ইংরেজ (Aclass of persons Indian in blood & Colour but English in taste, Opinions & intellect)। তিনি আরো পরামর্শ দেন যে এইভাবে সমাজের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেনীকে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে

পারলে, সে শিক্ষার ফলশ্রুতি স্বাভাবিক নিয়মে সমাজের নিম্নস্তরে নেমে আসবে। আর তার ফলে ভারতীয় সমাজের রুপান্তর ঘটবে। অর্থাঃ তিনি ভারতে শিক্ষার ক্ষেত্রে 'চুঁইয়ে পড়ার নীতি' (Downward filtratin theory) অনুসরণের সপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করলেন।

মন্তব্য

সামগ্রিকভাবে মেকলের এই মিনিটকে বিচার করলে বলা যায় তিনি ভারতে - (১) সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে প্রবর্তণ করতে চেয়েছিলেন। (২) তাঁর কাছে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের ইংরেজ প্রভুদের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষিত করা। (৩) ভারতীয়রা যাতে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে ভুলে গিয়ে, ইংরেজ শাসকদের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবান হয় সে বিষয়ে যোগ্য পরিবেশ রচনা করা , (৪) ভারতীয় দের ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই পাশ্চাত্য জ্ঞান আহরণ করে উচ্চ ও মধ্যবিত্তদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, জনশিক্ষার নয়। তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনাকে যদি অনুসরণ করা হয়, তাহলে তিরিশ বছর বাদে ভারতে সম্ভ্রান্ত শ্রেনীর মধ্যে একজন ও পৌত্তলিক খুঁজে পাওয়াযাবে না। এটাই ছিল তাঁর ঔপনিবেশিক মানসিকতার পরিচায়ক। উপনিবেশদের মূল কথা হল মানুষকে তারমূল সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করা ; তার মনে কিছু চিন্তা আরোপ কর এবং তাকে কিছুএমন সুবিধা দাও যাতে তার নিরপেক্ষ, স্বচ্ছচিন্তা শক্তি হ্রাস পায়।

শিক্ষা সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত (Government Resolution on Education)

সূচনা :

লর্ডবেন্টিংক ভারতে বড়লাট হয়ে আসার পর থেকেই ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের জন্যে সচেষ্ট হন। তিনি ১৮২৯ সালে এক চিঠিতে শিক্ষক কমিটিকে জানা - সরকারী নিতীই হবে ধীরে ধীরে সর্বক্ষেত্রে ইংরেজীকে চালু করা। এই কারণে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের সব রকম চেষ্টাকে সাহায্য করাই হবে সরকারের শিক্ষানীতি। ইংল্যান্ডে 'কোর্ট-অভ-ডাইরেক্টরস' বেন্টিংক এর এই নীতিকে সমর্থন করেন। কিন্তু বেন্টিংক ছিলেন সুচতুর প্রশাসক। তাই তিনি তাঁর নিজের ইচ্ছাকে পূরণ করার জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দ্বন্দ্বের অবসানের অজুহাতে মেকলেকে মাঝখানে খাড়া করেছিলেন। আবার অন্যদিকে প্রাচ্যবাদীদের আশ্বস্ত করার জন্য উইলিয়াম অ্যাডামকে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সম্পূর্ণ রিপোর্টের জন্য বেন্টিংক অপেক্ষা করেননি।

সরকারী সিদ্ধান্ত

মেকলের মিনিট বেন্টিংক এর ইচ্ছাই পূরণ করেছিল মেকলের সুপারিশ গুলি

টিপ্পনী

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
59

তিনি পুরোপুরি গ্রহণ করেন এবং ১৮৫৫ সালে ৭ই মার্চ কতকগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সিদ্ধান্তগুলিই ভারত সরকারের 'প্রথম শিক্ষানীতি' নামে পরিচিত। সরকারী সিদ্ধান্ত গুলি ছিল নিম্নরূপ :

এক : প্রথম সিদ্ধান্ত বলা হয় - ভারতীয়দের জন্য ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চার সব রকম ব্যবস্থা করাই হবে সরকারি শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য। শিক্ষার জন্য বরাদ্দ অর্থ, ইংরেজী বা পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য ব্যায় করা হবে।

টিপ্পনী

দুই : দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে বলা হয় যত দিন এদেশের লোক প্রাচ্যবিদ্যার প্রতি অণুরক্ত থাকবে, ততদিন পর্যন্ত প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার প্রতিষ্ঠান গুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হবেনা। তবে এই সব প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার প্রতিষ্ঠানের জন্য নতুন করে অর্থ সাহায্য দেওয়া হবে না। এই সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে ভারতীয়দের কিছুটা সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা হয়।

তিন : তৃতীয় সিদ্ধান্তে বলা হয় শিক্ষা কমিটি (G.C.P.I)প্রাচ্য ভাষায় বই ছাপাতে যে বিপুল ব্যায়ভার বণ করছে তা বন্ধ করে দেওয়া।

চার : চতুর্থ সিদ্ধান্তে বলা হয় এই সংস্কারের ফলে (দ্বিতীয় ও তৃতীয়) সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার ফলে)শিক্ষা কমিটির হাতে যে অর্থ উদ্বৃত্ত হবে, সেই অর্থ শুধুমাত্র ইংরেজী ভাষা মাধ্যমে ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চার জন্যই বিনিয়োগ করা হবে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রচলিত দেশজ শিক্ষা ব্যবস্থা

প্রায় দুই হাজার বছরের কালস্রোতে এক রাজনৈতিক উত্থান পতনের ফলে ভারতের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা বহুলাংশ ধ্বংস হয়েছিল। কিন্তু রক্ষণশীল পরিবেষ্টনীর মধ্যেও হিন্দু উচ্চ শিক্ষার বহু প্রতিষ্ঠান কোন রকমে আত্মরক্ষা করে টিকে ছিল। ঠিক তেমনই আনুকূল্য স্তিমিত হলেও মুসলিম উচ্চশিক্ষার বহু প্রতিষ্ঠান বেঁচে ছিল। অপরদিকে চিরদিনের রাজানুকূল্য বর্জিত জনসাধারণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাঠশালা এবং মক্তব আগেকার মতই জনসাধারণের পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষীণকায় অস্তিত্ব রক্ষা করে চলে ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মিশনারীর দল টোল ও মাদ্রাসার ধর্মীয় ভাবধারা সম্বন্ধে শত্রুভাবাপন্ন হলেও প্রাথমিক শিক্ষার দেশজ প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মিশনারী কিংবা পাশ্চাত্য বাদীদের মনে দেশজ প্রতিষ্ঠানের প্রতি কোন মমতাই থাকবার কথা নয়। তাই শিক্ষা বিতর্কের কালে এইসব প্রতিষ্ঠানের দাবি তাঁর মনে আদৌ স্থান পায়নি। তবুও এইসব প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয়েছে। মারাঠা শক্তির সম্পূর্ণ পতনের ফলে সমগ্র দক্ষিণ, পশ্চিম এবং উত্তর ভারত ইংরেজের কবলিত হয়। অধিকৃত এইসব অঞ্চলে অর্থাৎ মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশে (পরবর্তী কালে সংযুক্ত প্রদেশ) নতুন প্রশাসন গড়ে তুলতে হয়। তাই পূর্বেকার প্রশাসন, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন, রাজস্ব ও ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানে সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা সম্পর্কীয় তথ্যও গৃহীত হয়।

মাদ্রাজের গভর্নর মনোরোর নির্দেশে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে সংগৃহীত তথ্যাদির সারসংক্ষেপ করলে দেখা যায় যে সে আইনে প্রতি হাজার অধিবাসীর জন্য ছিল একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। নারী শিক্ষার বিশেষ প্রচলন ছিল না। সুতরাং মহিলা জনসংখ্যা বাদ দিলে বিদ্যালয় ছিল প্রতি ৫০০ জনে একটি। পাঁচ থেকে দশ বছর বয়সের শিশুর এক তৃতীয়াংশ শিক্ষালাভের সুযোগ পেত। বহু ক্ষেত্রে বালকরা ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত স্কুলে থাকত। বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যার পাঁচগুন শিশু শিক্ষালাভ করত বাড়িতে। পাঠক্রমের মধ্যে ছিল পঠন, লিখন, সাধারণ গণিত, চিঠি এবং চুক্তিপত্র রচনা প্রভৃতি। অবশ্য শিক্ষকের স্বল্প বিদ্যা, পাঠক্রমের সীমাবদ্ধতা, ছাপানো বইএর প্রভৃতি বহু ত্রুটিও ছিল।

টিপ্পনী

বোম্বাইয়ে গভর্নর এলফিনস্টোনের নির্দেশে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে সংগৃহীত তথ্যে দেখা যায় যে প্রাথমিক বিদ্যালয় বিহীন গ্রাম ছিল না।অবশ্য এইসব বিদ্যালয়ে মুখ্যত ছেলেরাই পড়ত। মেয়েদের শিক্ষা ছিল নগণ্য। ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রায় এক - তৃতীয়াংশ শিক্ষা লাভ করতে এবং কোন কোন সম্ভ্রান্ত শ্রেনীর শতকরা ৯০ জনই ছিলেন শিক্ষিত। আহমদনগর,পুনা প্রভৃতি স্থানে ছিল বহু উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বস্তুত ১৮১০ খ্রীঃ বোম্বাই শিক্ষা সমিতি (Bombay Education Society) মন্তব্য করেছেলেন যে এদেশে তদানীন্তন শিক্ষার হার ইংল্যান্ডের তদানীন্তন শিক্ষার হার থেকে বেশি।

দেশীয় শিক্ষা সম্পর্কে অ্যাডামের বিবরণী (ADAM'S REPORT ON INDIGENOUS SYSTEM OF EDUCATION)

বাংলাদেশের সমীক্ষা পরিচালনা করেন পাদরী রেভাঃ উইলিয়াম এ্যাডাম। উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অপরাধে নিজ ধর্মগোষ্ঠী থেকে বিতাড়িত ভারত প্রেমিক পাদরী এ্যাডাম ১৮২৯ এবং ১৮৩৪ খ্রীঃ এই সমীক্ষার প্রস্তাব করে সরকারের সাড়া পান না। পরিশেষে বড়লাট বেন্টিঙ্ক ১৮৩৫ খ্রীঃ তাঁকেএই সমীক্ষার সুযোগ এবং দায়িত্ব দেন। তিন ১৮৩৫ খ্রীঃ পরপর দুইখানি রিপোর্ট এবং ১৮৩৮ খ্রীঃ তৃতীয় রিপোর্ট পেশ করেন।

প্রথম রিপোর্ট :

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

প্রথম রিপোর্টটি মূলত ছিল সরকারী দলিল, শিক্ষা কমিটির দপ্তরে সংগৃহিত রিপোর্ট; মিশনগুলির কার্যবিবরণী এবং পত্রপত্রিকা থেকে সংগৃহীত তথ্যাদির সারসংক্ষেপ। এই রিপোর্টে এড্যাম দাবি করেন যে তখনকার বাংলাদেশে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ অর্থাৎ প্রতি ৪০০ ব্যাক্তির জন্য একটি প্রাথমিক স্কুল।

টিপ্পনী

দ্বিতীয় রিপোর্ট :

দ্বিতীয় রিপোর্টে সন্নিবেশিত হয় রাজসাহী জেলার নাটোর থানার বিস্তৃত তথ্য। এখানে দেখা যায় যে ৪৮৫ টি গ্রামে ছিল ২৬ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ছাত্র সংখ্যা ছিল ২৬২। তদুপরি ২৩৮ গ্রামের ১৫২৮ টি পারিবারিক বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা ছিল ২৩৪২। সুতরাং পারিবারিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভে করত সাধারণ স্কুল থেকে বহুগুন বেশি শিশু। প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল নানা ধরনের - যেমন দেশজ প্রাথমিক, অদেশজ প্রাথমিক পারিবারিক, দেশীয় নারী শিক্ষালয়, বয়স্ক বিদ্যালয়, ইংরেজী বিদ্যালয় প্রভৃতি। ভাষা মাধ্যমও ছিল নানা ধরনের। বিভিন্ন বিদালয়ে শিক্ষার মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হত ইংরেজী, আরবী, ফরাসী, বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি নানা ভাষা। সমীক্ষাধীন অঞ্চলে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানরূপে ছিল আবাসিক ও অনাবসিক ৩৯৭ জন শিক্ষার্থীর জন্য ৩৮টি টোল। স্ত্রী - শিক্ষার প্রচলন ছিল অতি নগন্য। তথাপি সমীক্ষাধীন অঞ্চলে লিখন-পঠন শক্তি সম্পন্ন শিক্ষিতর হার ছিল আনুমানিক প্রায় প্রায় শতকরা ৬ ভাগ।

তৃতীয় রিপোর্ট :

এ্যাডোমের তৃতীয় রিপোর্টে স্থান পায় মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, ত্রিহুত এবং দক্ষিণ বিহার- এই পাঁচটি জেলার সমীক্ষা। সমীক্ষাধীন অঞ্চলে পারিবারিক বিদ্যালয় ছাড়া সাধারণের প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল ২৫৬৭ টি এবং ছাত্রসংখ্যা ৩০৯১৫। তদুপরি ছিল বহুসংখ্যক পারিবারিক বিদ্যালয়। মোট জনসংখ্যার অনুপাতে বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা ছিল। ৭৩ জনে একজন। এবং মহিলা বাদ দিলে প্রতি ৩৬ জন একজন। স্থান এবং বর্ণভেদে পূর্ণবয়স্ক ব্যাক্তিদের মধ্যে স্বাক্ষরতার হার ছিল শতকরা ৮ থেকে ১২ ভাগ। কোন কোন উচ্চবর্ণের সকলেই ছিলেন স্বাক্ষর, আবার কোন কোন নিম্নর্ণের সকলেই ছিলেন নিরক্ষর। শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যাক্তিদের এ্যাডাম ছয়টিই ভাগে ভাগ করেন, যেমন উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক,. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ; অশিক্ষিত বুদ্ধিজীবী, প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত পূর্ণবয়স্ক, কেবলমাত্র লিখন - পঠনে সক্ষম ব্যাক্তি এবং কেবলমাত্র নিজ নাম পড়তে শিখতে পারেন এমন ব্যাক্তি।

এ্যাডাম রিপোর্টে সন্নিবেশিত বিদ্যালয়ের সংখ্য, ছাত্রসংখ্যা এবং শিক্ষার আর ইত্যাদি তথ্যের সম্পর্কেই একশত বৎসর পরে বিংশ শতাব্দীর চতুর্থপাদে ইংরেজ অভিমতের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী অভিমতের বিতর্কমূলক সংঘাত উপস্থিত হয়েছিল। ইংরেজ অভিমতের মুখপাত্র স্যার ফিলিপ হার্টগ এইসব তথ্যকে কল্পনাশ্রয়ী রূপকথা বলে আখ্যা দেন অপরদিকে ভারতীয় অভিমতের মুখপাত্র রূপে আর ডি পারুলেকর এড্যামের তথ্যকেই গ্রহণযোগ্য সত্যরূপে অভিহিত করেন বস্তুত বিতর্কের মূল প্রশ্ন ছিল বিদ্যালয় এবং সাক্ষরতার সংজ্ঞা কি হবে। বর্তমান কালের মানদন্ডে সে যুগকে বিচার করা যায় না। সে যুগে যে ধরনের প্রতিষ্ঠানকে বিদ্যালয় বলাহত সেই নিরিখে এবং পারিবারিক বিদ্যালয়কেও বিদ্যালয়রূপে গণ্য করলে এড্যামের তথ্য আদৌ কোন রূপকথা নয়।

রেভাঃ এ্যাডামের তৃতীয় রিপোর্টটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, কারন ঐ রিপোর্টেই রয়েছে তার বিশ্লেষণ এবং সুপারিশ। তিনি বলেন যে তদান্তীন কালে দেশজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল প্রধানত দুই শ্রেণীর প্রথম শ্রেণীভুক্ত ছিল উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ - হিন্দুদের টোল এবং মুসলিমদের মাদ্রাসা। পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্য অনুসারে টোল ও ছিল আবার তিন ধরনের - (১) ব্যাকরণ, ছন্দ ও অলঙ্কার প্রধান, (২) কাব্য, ন্যায় ও শাস্ত্র প্রধান এবং (৩) তর্কশাস্ত্র প্রধান। এইসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেওয়া হত উচ্চতম মানে। পাঠবস্তু এবং বিদ্যালয়ের আবহাওয়া ছিল ধর্ম প্রভাবিত। শিক্ষকরা ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং ছাত্রও অধিকাংশই ব্রাহ্মণ সন্তান। স্বভাবতই উচ্চশিক্ষার দ্বার সকলের কাছে উন্মুক্ত ছিল না। টোলগুলি ছিল নারী বর্জিত। এইসব বিদ্যালয়েই তৈরী হতেন সমাজের পন্ডিতবর্গ। সুতরাং শিক্ষকরা ছিলেন উচ্চতম শিক্ষার অধিকারী। শিক্ষার ভাষা - মাধ্যমে ছিল সংস্কৃত।

টিপ্পনী

নির্ভীক কণ্ঠে এ্যাডাম বলেন যে, ভারতের উন্নতি করতে হলে ভারতবাসীকে সাথে নিতে হবে। ভারতবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে সঙ্গী করা যাবেনা। নিজেদের উন্নতির জন্য ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ভারত তথা ভারতের প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে একাত্ম না হলে ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করা যাবে না।

তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বললেন যে, ইংল্যান্ডে যেমন পুরনো স্কুলগুলি জাতীয়শিক্ষার অংশ হয়েছে, ভারতেও তেমনইপ্রাচীন এতিহ্যের বাহক এইসব স্কুলকেই ভবিষ্যৎ জাতীয় শিক্ষার সৌধভিত্তিরূপে গ্রহণ করতে হবে। দীর্ঘকাল ধরে প্রচলি, জনসাধারণের নিকট সুপরিচিত এবং জনপ্রিয় এই শিক্ষাব্যবস্থার বদলে বহিরাগত কোন ব্যবস্থা জনজীবনের সঙ্গে একাত্ম হতে পারবে না। তাই রেভাঃ এ্যাডাম সংশোধন ও পরিবর্ধন করে দেশজ ব্যবস্থাকেই গ্রহণ করতে বলেন।

তিনি সংস্কারের জন্য এক কর্মসুচীও পেশ করেন। আরও ব্যাপক অনুসন্ধানের জন্য কর্মচারী নিয়োগের কথা তিনি বলেন। ভারতীয় ও ইউরোপীয় যৌথ প্রচেষ্টায় বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় এবং বিভিন্ন মানের পাঠপুস্তক রচনা এবং বিতরণ, গৃহ ও আসবাবপত্রের উন্নয়ন, শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধি চাকরি কালের মধ্যে তাঁদের শিক্ষক শিক্ষণ, শিক্ষতায় আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে ভূমি দান, পরীক্ষায় ছাত্রদের ফলাফল সন্তোষজনক হলে অন্যান্য রকম পরিতোষিক এবং এইসব ব্যবস্থা গ্রহণ করবার জন্য জেলা শিক্ষা পরিদর্শক নিয়োগের সুপারিশ ও রেভাঃ এ্যাডাম করেছিলেন।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
63

কিন্তু তিনি কেবল অরণ্যে রোদনই করলেন। বস্তুত তাঁর তৃতীয় রিপোর্ট পেশ করার আগেই লর্ড বেন্টিঙ্ক তাঁর রায় দিয়ে রেখেছেন। ফলে এড্যামের রিপোর্ট হয়ে রইল সরকারী দপ্তরখানায় ইতিহাসের দলিল এবং উত্তরকালে ভারতবাসীর যুগপৎ গৌরব ও বেদনার উৎস। বস্তুত ইংরেজ সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ভিত্তি দৃঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক বিশেষ সংস্কৃতি ও শিক্ষা প্রয়োগ করতে কর্তৃপক্ষ ততদিনে স্থির

নিশ্চিত হয়েছিলেন দেশীয় ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত দেশীয় ভাষায় দেশীয় শিক্ষা, বিশেষত গণশিক্ষায় বদলে কর্তৃপক্ষ ইংরেজী ভাষায় কেবল উচ্চশ্রেণীর জন্য এক নতুন শিক্ষা প্রবর্তণ করলেন। দেশের মাটি থেকে দেশীয় শিক্ষা - বৃক্ষ উৎপাটিত হল এবং সেখানে এক ভিন্ন দেশীয় চারাতুলে এনে রোপন করার ব্যবস্থা হল।এ শিক্ষা তাই ভারতের কাছে সম্পূর্ণ আত্মস্থ হল না। এরই ফলশ্রুতি হল উত্তরকালে পর্যায়ে পর্যায়ে প্রতিবাদ এবং সংস্কার আন্দোলন।

টিপ্পনী

এড্যাম রিপোর্ট অগ্রাহ্য করার সুদূর প্রসারী বিরূপ প্রভাব ঘটেছে গণ-শিক্ষার উপর। একটি ঐতিহ্যসম্পন্ন স্বাভাবিক গণশিক্ষার ব্যবস্থা শুকিয়ে মরে গেল, নতুন কোন গণশিক্ষা ব্যবস্থা তার পরিবর্তে স্থাপন করা হল না। পরিণামে সৃষ্টি হল এক বিরাট শূণ্যতা। শতাব্দীর শেষভাগে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি নতুনভাবে দৃষ্টি নিবন্ধ হওয়া পর্যন্ত অর্ধশতাব্দীকাল এক বিরাট জনসমুদ্র এই শূন্যতার মধ্যে শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত রইল। এই বঞ্চনার মধ্যেই সৃষ্টি। বর্তমান কালের প্রাথমিক শিক্ষার বহু সমস্যা। শিক্ষায় সার্বজনীনতার সমসভা, শিক্ষক সংখ্যার সমস্যা, স্কুল গৃহের সমস্যা, নিরক্ষরতার সমস্যা প্রভৃতি। অনেক কিছুই বোঝা লাঘব হত যদি এ্যাডেমের সুপারিশ কার্যকর করা হত । কিন্তু ইতিহাসের গতিপথে উঠন্ত সাম্রাজ্যবাদের একটি উপনিবেশের সে ভাগ্য সম্ভব ছিল না।

অনুশীলনী

১। ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাচ্য - পশ্চাত্য দ্বন্দ্ব বলতে কি বোঝ? মেকলে কিভাবে এর মীমাংসা করেছিলেন ?

২। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে বঙ্গদেশে পাশ্চাত্য প্রাচ্যবাদীর দ্বন্দ্বের কারণ গলো কি? মেকলে কিভাবে এর মিমাংসা করেন ?

৩। ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে ১৮১৩ সালের সনদ আইন একটি পরিবর্তণ সূচক ঘটনা বিশ্লেষন মূলক আলোচনা কর।

৪। 'সনদ আইন ১৮১৩' আধুনিক ভারতীয় শিক্ষার উল্লেখযোগ্য প্রস্তর ফলক হিসাবে বিবেচিত হয়। উদাহরণ সহ আলোচনা কর।

বাংলার নবজাগরণ

নির্দেশমূলক উদ্যেশ্যাবলী

এই অধ্যায়ের শেষে শিক্ষার্থীরা -

১। রামমোহন রায়ের শিক্ষাক্ষেত্রে

২।বাংলার নবজাগরনের মূল বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবে।

৩। সিক্ষাক্ষেত্রে নবজাগরণে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান বিবৃত করতে পারবে।

৪। ডিরেজিওর অবদান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে।

টিপ্পনী

ব্রিটিশ ইষ্টিন্ডিয়া কোম্পানী এদেশে বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যেই এসেছিল। কিন্তু দেশের তদানীন্তন পরিস্থিতির চাপে, তারা সামরিক শক্তি অর্জনের প্রয়াসে নিজেদের নিয়োজিত করে। প্রথমে ব্যবসা - বাণিজ্য রক্ষার জন্য, পরে রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তারের জন্য। বহু ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে, তারা এদেশে রাজনৈতিক ক্ষমতা দক্ষল করে, শাসক শ্রেনীতে রূপান্তরিত হয়। বাংলায় রাজনৈতিক ক্ষমতার দরুণ কলকাতা তাদের শক্তির কেন্দ্রে রূপন্তরিত হয়। কোম্পানী - সরকার উপলব্ধি করলেন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে ভারতীয়দের বিশেষভাবে বাঙ্গালীদের সাহায্য প্রয়োজন হয়ে পড়লো কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্যও সাম্রাজ্য যত বাড়তে লাগলো তাঁরা ভারতীয়দের বিশেষ ভাবে বাঙালীদের সাহায্য প্রয়োজন হয়ে পড়লে । কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য যত বাড়তে লাগলো তাঁরা ভারতীয়দের বিশেষ করে বাঙালীদের সরকারী বিভিন্ন দপ্তরে কাজের জন্য নিয়োগ করতে লাগলেন । এছাড়া, দদনী বণিক, শ্রফ্, বেনিয়ান, আড়তদারী, ঠিকাদারী ইত্যাদির মত অর্থকারী বৃত্তিতে নিযুক্ত মানুষদের নিয়ে ক্রমে একটি সামাজিক গোষ্ঠী গড়ে উঠতে লাগলো ।একেই সমাজ বিজ্ঞানের শ্রেনিবিন্যাসে বলা হয় মধ্যবিত্ত সমাজ। পরে বিভিন্ন দেশীয় শিল্পের মালিক, আইনজীবী, শিক্ষক, চিকিৎসক ইত্যাদি বৃত্তিজীবিগণ ও এই মধ্যবিত্ত সমাজে যোগ দিয়ে তাকে পুষ্ট, সমৃদ্ধ ও প্রভাবশালী করে তুলতে লাগলেন। আবার পাশাপাশি ইংরেজ কোম্পানী পলাশীর যুদ্ধে সফলতার পর অনুভব করলেন তাঁদের নব অধিকৃত সাম্রাজ্যকে যদি রক্ষা করতে হয়, তবে এদেশের মানুষেরই সমর্থন প্রয়োজন। সামরিক শক্তির দ্বারা সাম্রাজ্যকে দীর্ঘদীন ধরে রাখা যাবে না। তাই সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য তাদের এক শ্রেনীর অনুগত সমর্থক সৃষ্টি করা প্রয়োজন হয়ে পড়লো । আর এই উদ্দেশ্যে কোম্পানী সরকার ভূমিরাজস্ব ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে একদল বিশ্বাসি নির্ভরশীল জমিদার শ্রেণীর মানুষের সৃষ্টি করলো। এইসব জমিদারেরা বেশীর ভাগই গ্রামে বসবাস করতেন না ; বেশী সময় শহরে অতিবাহিত করতেন। গ্রামে, কাজ করতেন তাঁদের প্রতিনিধিরা। এই নতুন ভূমিরাজস্ব

টিপ্পনী

ব্যবস্থার ফলে, ছোট ছোট জমিদার, জোতদার, তালুকদার পত্তনিদার প্রভৃতির মত কিছু মধ্যস্বত্বভোগী মানুষের সৃষ্টি হল যাঁরা গ্রামেই বসবাস করতে বাধ্য হতেন। এছাড়া শহরে জমিদার দের নায়েব, গোমস্তরা গ্রামেই রইলেন তাদের প্রতিনিধি হিসেবে। ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে গ্রামে মহাজন শ্রেণীরও সৃষ্টি হল। গ্রামে বসবাসকারী, আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল এইসব মানুষদের নিয়েও গ্রামীন এক সমাজগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল যারা ক্রমে ক্রমে গ্রামীণ প্রশাসনকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে এনে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণ করে। এই গ্রামীণ সমাজগোষ্ঠী ও মধ্যবিত্ত চরিত্র লাভ করে। এমনিভাবে, সামাজিক বিবর্তনের ধারায় ভারতীয় সমাজে এক সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয় ঊনবিংশ শতকের শুরুতেই এইমধ্যবিত্ত শ্রেনী সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে থাকে বিদেশীদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ ভোগ করার ফলে এবং বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগ পাওয়ায়, এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষেরা ক্রমে বিভিন্ন সামাজিক কু-সংস্কারের প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত করতে থাকে। মিশনারীদের শিক্ষা প্রচেষ্টার ফলে, এদেরই মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ ; পাশ্চাত্য শিক্ষা, ইউরোপীয় দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসে। এই পরিচিতির ফলে তারা নতুন ভাবধারায় অনুপ্রণীত এক নতুন সংস্কৃতি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে।পাশ্চাত্য শিক্ষায় শীক্ষিত এই নতুন মধ্যবিত্ত সম্প্রদাবের সৃষ্টি করে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এই নতুন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, যাদের আমরা মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবি বোলতে পারি, তারা গতানুগতিকতা থেকে মুক্ত হয়ে, রক্ষণশীলতা ত্যাগ করে, যুক্তি বিচারের মাধ্যমে সব কিছুর মূলায়ন করতে সচেষ্ট হয়। এর ফলে ঊনবিংশ শতকে বাংলাদেশে শিক্ষা, সংস্কৃতি ধর্ম ও সমাজ, এবং কথায় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নতুন প্রাণের স্পন্দন অনুভুত হয়, ঐতিহাসিক গণ একে 'নবজাগরণ' নামে অভিহিত করেন। এই অবস্থা সরষ্টির জন্য এককভাবে কোন ব্যাক্তি বা ঘটনাকে দায়ী করা যায়না। এ ছিল এক সামগ্রিক চেতনা। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসার, জাতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা ধর্মক্ষেত্রে একেশ্বরবাদের প্রচলন, বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিকাশ। গীতি কবিতার সুচনা, জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের উদ্বোধন ইত্যাদির মধ্যে এই সামগ্রিক চেতনার প্রকাশ ঘটলো। বহু দিনের চিন্তার জড়তা কাটিয়ে, বাংলার সাহিত্য, বাঙালী সমাজ, বাঙালীর ধর্ম বিশ্বচেতনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠলো এই সময়কার সামাজিক চেতনা যে সব মনীষিদের কাজের ও চিন্তার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল ; তাঁদের মধ্যে রামমোহন, বিদ্যাসাগরের এবং ডিরোজিওর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য অংশে আমরা এই তিন বিশিষ্ট ব্যাক্তিত্বের কর্মকীর্তি সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

রাজা রামমোহন রায়

ভূমিকা :

যে যুগে ধর্মের নামে অধর্মকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছিল, যখন ধর্ম, সংস্কৃতি,

সাইত্য, রাজনীতি, সমাজচেতনা, অশিক্ষা, অজ্ঞনতা ও কুসংস্কারচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল আমাদের নিয়ন্ত্রক, শিক্ষাদীক্ষা, অর্থনীতি সমস্ত ক্ষেত্রেই যখন ভারতবর্ষ অবনতির চূড়ান্ত সিমাব পৌছে গিয়েছিল ঠিক সেই সময় সর্বপ্রথম চেতনার চাবুক হাতে নিয়ে যিনি শত শত বছরের বিকৃত সমাজ ব্যবস্থা ও সকল রকমের সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং ভবিষ্যতের নতুন দিগন্তের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন তিনি হলেন 'ভারত পথিক" রাজা রামমোহন রায় । হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে ১৭৭২ খ্রীঃ ২২শে মে (মতান্তরে ১৭৭৪) এক সম্ভ্রান্ত গোঁড়া হিন্দু পরিবারের তিনি জন্মগ্রহণ করেন । তার পিতা ছিলেন রাধাকান্ত রায় এবং মাতা ছিলেন তারিণি দেবী । সেই অবক্ষয়ের যুগেই রামমোহন নবযুগের সাধারণ উপযোগি করে নিজেকে গঠন করেছিলেন । পরবর্তী যুগে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলা তথা ভারতের নবজাগরণের যুগ । রামমোহণ রায় তাঁর অসাধারণ মনিষা ও কর্ম প্রচেষ্টায় ধর্মতত্ত্ব, সমাজ সংস্কার, শিক্ষা, সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা, জনমত গঠন এবং পুস্তক - পুস্তিকা প্রকাশ ও সভা সমিতি স্থাপন করে দেশের মানুষের মন থেকে শত শত বৎসরের কুসংস্কার ও অশিক্ষার অন্ধকার দূর করে আমৃত্যু (১৮৩৩ইংল্যান্ডের ব্রিস্টলে) ভারতবাসীর সেবায় ও আধুনিক ভারত প্রতিষ্ঠার নতুন প্রাণসঞ্চার করে গেছেন।

টিপ্পনী

উদ্দেশ্য

(ক) রামমোহন রায়ের শিক্ষার প্রসার ও সমাজসংস্কার সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কতখনি উপযোগী ছিল তার সঠিক বিশ্লেষন করাও একটিও গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

(খ) তৎকালীন রাজনৈতিক ; আর্থসামাজিক কাঠামোয় রামমোহন রায়ের ব্যাক্তিগত জীবন তৎকালীন শিক্ষারপ্রসার ও সংস্কার সম্পর্কে সম্যক ধারনা লাভ করা এই ঐতিহাসিক অনুসন্ধানটির একটি অন্যতম উদ্দেশ্য।

(গ) রামমোহন রায়ের ব্যাক্তিগত জীবন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারনা অর্জন এবং মানবতাবাদী নেতা এবং সংস্কারক হিসাবে তার শিক্ষা চিন্তার মাধ্যমে মানব জগতের কতখানি উপকার সাধন করেছেন তার যথাযথ অনুসন্ধান এই বিষয়টির আর একটি প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য।

(ঘ) তৎকালীন সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারের প্রতি তিনি যে প্রতিবাদ জানিয়ে ছিলেন তা কতটা সমাজে প্রতিফলিত হয়েছে তা যথাযথ অনুসন্ধান ও একটি উদ্দেশ্য ।

(ঙ) পরিশেষে বলা যায় বৃহত্তম সমাজের নতুন প্রজন্মের নিকট শিক্ষাক্ষেত্রে রামমোহন রায়ের অবদান ও চিন্তা ছড়িয়ে দেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

টিপ্পনী

রাজা রামমোহন রায়ের শিক্ষার প্রসার ও সমাজ সংস্কারে তাঁর ঐতিহাসিক অনুসন্ধানমূলক বিশ্লেষন

রামমোহন রায়ের বহুমুখী প্রতিভার নানা দিক সম্পর্কে সামান্য উল্লেখ করা হলেও এই অধ্যায়ে শিক্ষানুরাগী ও সমাজসংস্কার রামমোহনের আলোচনা বিশেষভাবে করতে চাই। সমাজ, ধর্মও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন রামমোহন নানা প্রকার সংস্কার প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। তেমনি শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অগ্রদূত। তিনি স্বীয় পান্ডিত্য বলে অনুধাবন করেছিলেন, ভারতীয় অতীত ইতিহাসে গভীরতাএবং আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব। শিক্ষা সমাজের অধিবাসীদের একটি যুক্তিশীল পরিশীলিত মনের অধিকারী করে গড়ে তুলবে। মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি করা তাদের বুদ্ধির জড়তা দূর করা, হীনমন্য তা বোধ দুর করা ইত্যাদি ও শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করতেন। তিনি বুঝেছিলেন যে প্রচলিত শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না হলে শতশত বছরের ঘুম থেকে ভারতীয়দের কে জাগ্রত করা যাবে না। সমস্ত শিক্ষা ও সমাজকে ঢেলে সাজাতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থার ও সমাজ ব্যবস্থার। যার ফলে মানব মনের পরিপূর্ণ বিকাশই তার মতে শিক্ষা ও সমাজের লক্ষ্য।

(১) শিক্ষার লক্ষ্য :

রামমোহনের মতে শিক্ষার লক্ষ্যহবে জাগতিক ও সমাজকল্যাণ। শিক্ষার মাধ্যমে একটি পরিশীলিত ও যুক্তিবাদী মনের জন্মহোক এও তাঁর লক্ষ্য ছিল। রামমোহন মনে করতেন শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে বুদ্ধির জড়োতা ও মনের পরবশ্যতা দুর করার জন্য জ্ঞানবৃদ্ধ করা। শিক্ষার মাধ্যমে তিনি মানুষের মনের পরিপূর্ণ বিকাশ ও উন্নতির দিকে নজর দিয়েছিলেন।

(২)প্রাচ্য পাশ্চাত্য বিদ্যার সমন্বয় :

যে সময় মিশনারিরা এদেশে তখন রামমোহন নতুন শিক্ষার প্রয়োজনের কথা অনুভব করেছিলেন। রামমোহনই প্রথম বুঝেছিল যে, ভারতে সত্যিকারের উন্নতি নির্ভর করছে প্রাচ্য সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমন্বয়ের উপর। তিনি হিন্দুধর্ম বা সংস্কৃতিকে ত্যাগ করেননি, বরং - পাশ্চাত্যর আধুনিক জ্ঞান -বিজ্ঞানের যা কিছু ভাল ও গ্রহণীয় তা গ্রহণ করে তিনি নিজের দেশের সংস্কৃতির ভান্ডারকে পুষ্ট ও সমদ্ধ করতে চেষ্টা করেন। এর ফলে ভারতে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছিল।

(৩) ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য প্রবর্তনের পক্ষপাতি :

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী শিক্ষাও পাশ্চাত্য ভাবধারার সম্পর্কে বাংলাদেশের যে নবযুগের সুচনা হয়েছিল রাজা রামমোহন রায় ছিলেন সেই আভিনব

যুগের ঋত্বিক। ইউরোপের জাগরনের বাহন হল ইংরেজী ভাষন তাই তিনি ইংরেজী ভাষন, তাই তিনি ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতি ছিলেন। মরনোমুখ জাতিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করার পন করলেন রাজা রামমোহন।তিনি ভারতে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য আন্দোলন করেন।

(৪) ১৮২৩ খ্রীঃ লর্ড আর্মহাষ্টকে লেখাপত্র :

শিক্ষা সংস্কার রাজা রামমোহন রায়ের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল এদেশে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারকলপে লর্ড আমহাস্টকে পএরিত একটি চিঠি। এই পত্রটি নবযুগের নব্য শিক্ষা ব্যবস্থার শঙ্খধবনি। তিনি ১৮২৩ ক্রীঃ (১১ই ডিসেম্বর) তৎকালীন বড়লাট লর্ডআমহাস্তের নিকট পত্রে প্রস্তাব করেছিলেন যে মঞ্জরীকৃত অর্থের দ্বারা কলকাতায় একটি সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় স্থাপন না করে ঐ অর্থের সাহায্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হোক। ঐ চিঠিতে তিনি ভারতবাসীকে পাশ্চাত্য গণিত, বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি প্রভৃতি বিদ্যায় সুশিক্ষিত করে আধুনিক করে তুলতে রামমোহন রায়ের এই পত্রখানি ছিল ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষার প্রথম সনদ।

টিপ্পনী

(৫) সাংবাদিকতা ও পত্রপত্রিকা প্রকাশন

ভারত পথিক রামোহনের জীবের ব্রত ছিল দেশবাসীর কুসংস্কারচ্ছন্ন মনকে আলোকিত করা। শিক্ষা ও সংস্কারের ভিতর দিয়ে জাতীকে প্রগতির পথে নিয়ে যেতে হবে এই ছিল তার পণ। তাঁর ধর্ম সম্বন্ধীয় ও শিক্ষা প্রচেষ্টার মূলে যে প্রেরণা ছিল নানা পুস্তিকা রচনার মূলেও ছিল সেই প্রেরণা। আর এই প্রেরণার বলেই তিনি সাংবাদিকতার মনোনিবেশ করেন। রামমোহনের প্রগতিশীল আন্দোলনের মধ্যে ভূমিষ্ট হল বাংলা ভাষা 'সংবাদ কৌমুদী" (১৮২১ সালে) এবং ১৮২২ সালে ১২ই এপ্রিল ভাষায় 'মীরাৎ-উল-আখবর" নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।এইসব সমাধান প্রকাশিত হত বিতর্কমূলক বিষয়ের সমাধান প্রকাশিত হত তেমনি প্রয়োজনীয় শিক্ষার পরিবেশ রচিত হত।

(৬) ভারতীয় ভাষার চর্চা ও উন্নয়ন

ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের উপর গুরুত্ব দিলেও রামমোহন আধুনিক ভারতীয় ভাষার শিক্ষাকে মোটেই অবহেলা করেনি। তিনি ভারতীয় ছাত্রদের জন্য বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ, ভুগোল, জোতিবিদ্যা, জ্যামিতি প্রভৃতি বিষয়ে বই লেখে, বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও বিস্তারের যে চেষ্টা মিশনারীরা শুরু করেন রামমোহন সেই গুরুত্ব নিজের হাতে তুলে নেন এবং পরবর্তীকালে বাংলা ভাষায় দ্রুত উন্নয়নের পথ সুগম করে তোলেন।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

(৭) হিন্দু কলেজে স্থাপনের উৎসাহ দাতা

১৮১৭ খ্রীঃ হিন্দু কলেজ স্থাপনের অন্যতম উৎসাহ দাতা ডেভিড হেয়ার

ছিলেন রামমোহনের বন্ধু। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। কিন্তু রামমোহন হিন্দু সমাজ হিন্দু কলেজের ব্যাপারে তার উৎসাহকে সুনজরে না দেখায় তিনি শেষ পর্যন্ত সরে দাঁড়ান।

(৮) অ্যাংলো - হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠা

হিন্দু কলেজ কমিটিহতে সরে গিয়ে রামমোহন বাঙালী হিন্দু ছেলেদের ইংরেজী শিক্ষা দেওয়ার অভিপ্রায়ে ১৮২২ খ্রীঃ "Anglo Hindu School" স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার কাজে তাকে সাহায্য করেছেন ডেভিড এয়ার, উইলিয়াম অ্যাডাম, উইলসন প্রমুখ মনীষীবৃন্দ।

টিপ্পনী

(৯) উদার ও উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা

তিনি এদেশের জন্য বাইলেন এক উদার ও উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা যাতে গণিত, প্রকৃতি বিজ্ঞান, রসায়ন শারীরবিদ্যা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানচর্চার ব্যবস্থা থাকবে। কারণ এই শিক্ষা লাভ করে ইউরোপের জাতিবর্গ বিশ্বের অন্যান্য অংশের অধিবাসী অপেক্ষা উন্নতর হয়েছে। রামমোহন ভারতবর্ষকেও উন্নতর হয়েছে। রামমোহন ভারতবর্ষকেও উন্নততর ইউরোপীয় দেশের পাশে বসবাস স্বপ্ন দেখছিলেন।

(১০) রামমোহনের মত সরকারী নীতি হিসাবে গ্রহণ

১৮২৩ সালে এদেশে শিক্ষা বিস্তার কল্পে একটি কমিটি General Committee of Public Instruction (GCPI) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থার উপর সরকারী শিক্ষা পরিকল্পনা রূপায়নে দায়িত্ব দেওয়া হল। এই দায়িত্বের দীর্ঘ বারো বছর বিতর্কের পর ১৮৩৫ খ্রীঃ বেন্টিঙ্ক ও মেকলে রামমোহনের মতকেই সরকারী নীতি হিসাবে গ্রহণ করেন।

(১১) বেদ বিদ্যালয় স্থাপন

১৮২৫ খ্রীঃ রামমোহন বেদ বিদালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ে হিন্দু দর্শন ও সাহিত্যের সাধে সাধে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান পড়াশোনার ব্যবস্থা ছিল। ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের দৃঢ় ভিত্তির উপরই তিনিতাঁর স্বপ্নের প্রগতিশীল ভারত গড়তে চেয়েছিলেন পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞান আমদানী করে।

(১২) জনশিক্ষার বিস্তার :

উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও রামমোহন অজ্ঞ, দরিদ্র ও অনগ্রসর জনসাধারনের কথা ভুলে যাননি। তিনি তাদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য পরিশ্রম ও চেষ্টা করেছেন। তিনি একজন প্রকৃত সংস্কারক ছিলেন। তাঁর সমাজ সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষকে কুসংস্কার ও অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের পথে, সত্যের পথে আনা। তিনি চেয়েছিলেন সাধারণ মানুষকে মূল হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচয়

করিয়ে দিয়ে তাদের মধ্যে অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের অন্ধকার দূর করতে দরিদ্র কৃষ্কদের প্রতি তাঁর দরদী মনোভাব ছিল।

(১৩) বিভিন্ন বিদেশী মিশনকে স্কুল প্রতিষ্ঠায় সাহায্য :

শ্রীরামপুর ত্রয়ী, রেভারেন্ড, এ্যাডাম,স্কটিশ মিশনকে তিনি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সাহায্য করেছেন। এমনকি উগ্রপন্থী ডাফও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে তাঁর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হননি। ডাফ সাহেবকে স্কুল বসবার জন্য বাড়ী খুঁজে দিয়েছিলেন। ছাত্রছাত্রী সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন।

টিপ্পনী

(১৪) ব্রহ্ম সমাজ স্থাপন :

কলিকাতায় আসার পর রামমোহন 'আত্মীয়সভা" স্থাপন করে ছিলেন।কিন্তু এই সভা খুব কার্য্যকরী ও স্থায়ী না হওয়ায় রামমোহন দ্বারকানাথ ঠাকুর ও কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করে ব্রক্ষপাসনার জন্য একটি নতুন সভা স্থাপন করলেন। এই সভার প্রথম অধিবেশন হয় ১৮২৮ খ্রীঃ ২০শে আগষ্ট। ইহার নামকরণ হয় - "ব্রাহ্ম সমাজ"। প্রথমে এই ব্রাহ্মসমাজ বা ব্রাহ্মসভার কোন নিজস্ব বাড়ী ছিল না। কিছু দিন পরে অর্থ সংগ্রহ করে জোড়াসাঁকোয় জমি কিনে বাড়ী করা হলল। ১৮৩০ খ্রীঃ ২৩শে জানুয়ারী এই নূতন বাড়ীতে সমাজের কাজ আরম্ভ হয়। রামমোহন 'ব্রাহ্মসমাজ" কোন দিনই একটি ধম্মসম্প্রদায় ছিল না - ইহা বিশেষভাবেই স্মরণীয়। বস্তুত হিন্দু - মুসলমান, খ্রীষ্টান-ইহুদী সকলেই এই উপাসনায় যোগ দিত। পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায়ের সুচনা হয়েছিল এবং এই সমাজই পরে আদি ব্রাহ্মসমাজ নামে পরিচিত হয়েছে। রামমোহনের সভায় কোন সাম্প্রদায়িক নামে তার উপাসনা হতে পারবেনা। যে কোন ব্যাক্তি শ্রদ্ধার সহিত উপাসনা হতে পারবে না। যে কোন ব্যাক্তি শ্রদ্ধার সহিত উপাসনা করতে আসবেন, তাঁহারই জন্য জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়, সামাজিক পদ নির্বিশেষে মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত থাকবে।

(১৫) সমাজ-সংস্কার ; সহমরণ -প্রথার উচ্ছেদ :

রামমোহন যখন ব্রক্ষসভায় প্রতিষ্ঠা করেন। তখন এদেশে স্মরণ প্রথা নিয়ে তুমুল আন্দোলন চলছিল। রামমোহন সহমরন প্রথার বিরোথী ছিলেন ও যাতে এই নৃশংস প্রথা রহিত হয়, তাহার জন্য খুব চেষ্টা করছিলেন। আকবর প্রথমে এই প্রথা রহিত করিবার চেষ্টা করেন। ইংরেজ - শাসকদের মধ্যে লর্ড ওয়েলেস্লী প্রথমে এই প্রথা সংযমিতকরিবার চেষ্টা করেন। রামমোহন কলিকাতা আসার অল্প দিন পর হতেই সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেন। এরপর ১৮২৯ খ্রীঃ ৪ঠা ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক এই প্রথা আইন বিরুদ্ধে বলে ঘোষনা করলেন। সতীদাহ প্রধা উচ্ছেদের চেষ্টাই এদেশের নারীদের জন রামমোহনের একমাত্র কল্যান কর কাজ নয়।নারী জাতি সম্বন্ধে রামমোহনের অতিময় উচ্চ ধারনা ছিল। তাহারা যাতে সম্পত্তির অধিকারিণী হয়, সে বিষয়েও রামমোহন আন্দোলন করেছিলেন।

টিপ্পনী

(১৬) নারী মুক্তি আন্দোলন ও স্ত্রী - শিক্ষা বিস্তার

স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের জন্যেও তিনি সচেষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি মেয়েদের শিক্ষা না দিয়ে অনগ্রসর করে রাখার তীব্র বিরোধীতা করেন। হিন্দুদের মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তারে রামমোহনের কৃতিত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নানা হিন্দুশাস্ত্র থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করে তিনি প্রমাণ করেচেন যে অতিপ্রাচিনকাল থেকে সমাজে নারী শিক্ষার বিশেষ প্রচলন ছিল, নারীরা সমাজে যথেষ্ট মর্যাদা পেতেন। তিনি সমাজে মেয়েদের পুরুষদের সমান মর্যাদা দানের পক্ষপাতী ছিলেন। ১৮২২ খ্রীঃ নারীদের প্রাচীন অধিকারের বর্তমান, সংকোচনের উপর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য নামেএকটি পুস্তিকা লেখেন। নারীমুক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত রামমোহনের নেতৃত্বেই ঘটেছিল সন্দেহ নেই।

(১৭) পুস্তক রচনা

১৮১৫ খ্রীঃ থেকে ১৮৩০ খ্রীঃ মধ্যে রামমোহন রায় প্রায় তিরিশখানি পুস্তক রচনা করেন। বেদ বেদান্ত ও উপনিষদের অনুবাদ (১৮১৫ -১ ৮১৯) কু-সংস্কারেরবিরুদ্ধে প্রতিবাদ মূলক রচনা সমূহ (১৮১৫ - ১৮২৯) ব্রহ্মসঙ্গীত (১৮২৮) গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮৩০) ইত্যাদি পুস্তকে তার যুক্তিবাদী মননশীলতার বিশেষ পরিচয় পাওবা যায়।

(১৮) বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক

সে যুগের বংলা সাহিত্য পাঠকের যেমন অআব ছিল তেমনি বাংলা গদ্য সাহিত্যের ও যথেষ্ট অভাব ছিল। রামমোহনের পূর্বেই শ্রীরামপুর মিশনারীরা এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পন্ডিতমন্ডলী বাংলা গদ্য রচনায় অগ্রণী ছিলেন কিন্তু তাদের রচনা আশানুরূপ হৃদয়গ্রাহী, সতেজ ও সাবলীল ছিলেন।রামমোহনই হল প্রথম ব্যাক্তি যিনি বাহুল্য বর্জিত আড়ষ্টতাহীন ও হৃদয় গরাহী সরলগদ্য সাহিত্যে রচনায় সক্ষম হন। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন, রামমোহন বঙ্গ সাহিত্যিকে গ্র্যানিট স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জমান দশা হতে উন্নত করে তুলেছিলেন।

উপসংহার

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অসীম শক্তিশালী রামমোহনের চিন্তা ও চরিত্র সমাজের অভ্যস্ত জড়ত্বের ওপর বারবার আঘাত হেনে এক নবজীবনের চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। ধর্মে সমাজ, রাষ্ট্রে অধঃপতিত জাতিকে টেনে তুলবার জন্য রামমোহন সমস্ত প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে একা দাঁড়িয়ে যে কি অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করেছিলেন, আজকের দিনে তার ধারনা করা কঠিন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে য়, "তিনি কি না করে ছিলেন? শিক্ষা, রজনীতি, বঙ্গভাষা, বঙ্গ সাহিত্য, ধর্ম, সমাজ, বঙ্গ সমাজের যে কোন বিভাগে উত্তরোত্তর যতই উন্নতি হয়েছে,সে কেবল তাঁহারই হস্তাক্ষর নূতন নূতন পৃষ্ঠায় উত্তরোত্তর পরিস্ফুটই হয়ে উঠেছে মাত্র।

বিদ্যাসাগর

কবি মাইকেল শ্রী মধুসূদন দত্তের ভাষায় -"Vidyasagarr has te genius & wishdeone of an ancient sag. The energh of an English man & the heart of a BengalyMother." তিনি ছিলেন বিদ্যার সাগর, করুণা সিন্ধু ও দীনের বন্ধু । বিদ্যাসাগরের মধ্যে ছিল প্রাচীন মুনি ঋষির মনিষা ও প্রজ্ঞা তথা ইংরেজদের প্রাণশক্তি ও বাঙালী মায়ের স্নেহ সুকমল হৃদয় । তার অগাধ পান্ডিত্য প্রতিভা সমগ্র বাঙালী মানুষের আজও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

টিপ্পনী

বিদ্যা বুদ্ধিএমন অসামান্যতা কর্মনিষ্ঠ, কোমলতা ও কঠোরতার সমন্বয়ে সাধারণ বাঙালী চরিত্রের মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন। বিদ্যাসাগরের পান্ডিত্য ছিল মানব কেন্দ্রিক তিনি ছিলেন খাটি মানব দরদী ও বুদ্ধিজীবী। নবযুগের সূচনাব বিদ্যাসাগরের অবদান অনস্বীকার্য। তিনি বাংলার ভাবধারার নবজাগরণের অন্যতম নেতা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। তার কর্ম জীবনে সামগ্রিক শিক্ষা সমাজ চেতনা জাতিয় শিক্ষা সব দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণছিল।

সমাজসংস্কারক ও বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর সবসময় ধর্মীয় গোঁড়ামী ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন। মানবতাবোধের আদর্শ তাঁর জীবনের অন্যতম আদর্শ ছিল এই বোধের উপর জোড় দিয়ে সমাজে প্রয়োজনীয় সংস্কার গুলি দূরকরার উদ্দেশ্যে তিনি আন্দোলন করেছিলেন । তার সমাজ সংস্কারের দিকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - গণশিক্ষা বিস্তার, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার, বাল্যবিবাহ, বিধবা বিবাহ এবং আধুনিক বাংলা গদ্যের সংস্করণ এই সমস্ত দিক গুলিতে তাঁর অসামান্যতা আজও ভারতবাসীর কাছে শ্রদ্ধার বিষয় হয়ে রয়েছ।

(১) গণশিক্ষা ও বিদ্যাসাগর

বিদভাসাগরের লক্ষছিল প্রকৃত গণমুখী শিক্ষার বিস্তার জনসাসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার করাই তার শিক্ষা প্রচেষ্টার প্রথম লক্ষ্য ছিল । তিনি চাননি যে শিক্ষার ফসল কিছু মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান মানুষ ভোগ করুক। তিনি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের মধ্যে শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন তাই সংস্কৃত কলেজের দরজা তিনি অব্রাহ্মণ ছাত্রদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। জন সাধারণের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষাদান কাজকে মহৎ আদর্শ রূপে গ্রহণ করেছিলেন। সকলের শিক্ষার জন্য তিনি পাঠপুস্তক রচনা ও প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
73

(২) স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার

ঊনবিংশ শতাব্দীর নারি প্রগতি প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ও গৌরবোজ্জ্বল কাজ হল বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষারপ্রসারের জন্য তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা

তিনি স্ত্রীশিক্ষাকে আন্দোলনের স্তরে উন্নিত করেন। স্ত্রী শিক্ষায় তার অবদন হল -

(ক) বেথুন বিদ্যালয় স্থাপন :

১৮৪৯ খ্রীঃ বেথুন সাহেবের যখন শিক্ষা পরিষদেরসভাপতি ছিলেন তখন থেকে বিদ্যাসাগর তার সহকর্মী হিসাবে কাজ করেন। কলকাতায় বেথুন স্কুলের প্রচেষ্টা ভারতের স্ত্রী শিক্ষা প্রচলনের একটি স্মরণীয় ঘটনা।

টিপ্পনী

(খ) পল্লী অঞ্চলে নারীশিক্ষা বিস্তার :

বিদ্যাসাগর শুধু বাংলা তথা ভারতের প্রাণকেন্দ্র কলকাতার মধ্যে মধ্যবিত্ত সমাজে নারী শিক্ষার প্রতি গভীর আগ্রহ সৃষ্টি করেননি । বাংলার পল্লী অঞ্চলে নারী শিক্ষার ক্ষেত্র প্রস্তুত ও বিস্তার করেছিলেন । এই উদ্দেশ্যে ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্যাসাগর বর্ধমানের জৌ গ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

(গ) নারীশিক্ষার ভান্ডার :

তিনি আশা করেছিলেন যে তাঁর প্রতিষঠিত বিদ্যালয় গুলি ভারত সরকারের প্রাধান্য পাবে। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতে তিনি বুঝতে পারলেন যে ভারত সরকার আর্থিক সাহায্য দিতে অনিচ্ছুক। তাই বিদ্যালয়ের নারীদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সংস্থা থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে লাগলেন। এর জন্য তিনি নারী শিক্ষার ভান্ডার গঠন করলেন।

(৩) বিধবাবিবাহ প্রবর্তন

তিনি নারীজাতির বঞ্চনা রোধ করার জন্য তৎকালীন সময়ে বদ্ধপরিকর হন। ঘরে ঘরে বৈধব্যে কাতর ক্রন্দনে বিদ্যাসাগরের হৃদয় বিগলিত হয়। তিনি সমাজে বিধবাববাহ প্রবর্তনের জন্য কৃত সংকল্প হন। তার প্রচেষ্টায় ১৮৫৩ খ্রীঃ বিধবা বিবাহ বিধীবদ্ধ হন। বিধবা বিবাহ প্রবর্তন তার সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ এর মাধ্যমে তিনি সামাজিক বিধিগুলির মধ্যে জোড়ালো প্রতিবাদ করেন। তিনি তার পুত্রকে দিয়ে কুসংস্কারের প্রতিবাদ করেন।

(৪) বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ

সমাজের বর্তমান অবস্থা ও দেশবাসীর মনোভাব লক্ষ্য করে তৎকালীন সময়ে হিন্দু সমাজে বাল্য বিবাহ এক কঠোর ও কুসংস্কার রুপে পরিচালিত ছিল। সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা প্রথা ভঙ্গ করে ১০ বা ১১ বছরের অবিবাহিত বালিকাদের বাড়ি থেকে বের হতে দিত না তাছাড়া সমাজে কুলিন প্রথা প্রচলিত থাকায় খুব অল্প বয়সে মেয়েদের পাত্রস্থ করতে হত ফলে অল্প বয়সে তাদের জীবনে নেমে আসত সাংসারিক চাপ তথা মানসিক অশান্তি। বাল্য বিবাহ নিবারণ বিদ্যাসাগরের অন্যতম কীর্তি তিনি বাল্যবিবাহ ও বহু বিবাহের ক্ষেত্রে যেহাদ ঘোষনা করেন।

(৫) গদ্য সাহিত্য

শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের অন্যতম অবদান হল বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি, বাংলা গদ্য বিকাশের ক্ষেত্রে তার অসামান্য অবদান লক্ষ্য করা যায়। তিনি বাংলা গদ্যের সৃষ্টি কর্তা রূপে বিশেষ অভিধানে ভূষিত হয়েছিলেন। জনগনের সুবিধার জন্য তিনি গণ শিক্ষা ও গণ স্বাক্ষরতা বিকাশের উদ্দেশ্যে বর্ণমালার সংস্কার করেন। তিনি বাংলা ভাষাকে ঘষে, মেজে এক উন্নত চিন্তার বাহন করে তোলার জন্য চেষ্টা করেন। বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ করে তিনি সাধারণ সাহিত্যকে বিদেশী পাঠকদের কাছে দরজা রূপে খুলে দেন।বিদ্যাসাগরের আগে বাংলা গদ্যে 'যতি' চিহ্নের ব্যবহার ছিল না। তিনি প্রথম 'যতি' চিহ্নের ব্যবহার করেন। বর্ণপরিচয়ের মাধ্যমে তিনি যে রূপ প্রাথমিক শিক্ষার দ্বারা মুক্ত করে ছিলেন। তেমনি তাঁর রচিত বোধদয়, কথামালা, বেতাল পঞ্চবিংশতি, সীতার বনবাস প্রভৃতি পুস্তক সব বয়সের শিক্ষার্থীকে আকৃষ্ট করেছিল।

টিপ্পনী

(৬) সংবাদ পত্র ও বিদ্যাসাগর

সংবাদপত্রের জগতেও বিদ্যাসাগরের অবদান গুরুত্বপূর্ন ছিল। এক্ষেত্রে তার অসামান্য মনিষার পরিচয় পাওয়া যায় তৎকালিন সর্বজন বিধিত পত্রিকা 'তত্ত্ববোধিনী' ও 'সর্ব শুভঙ্করী' এই দুটির সঙ্গে তিনি গভির ভাবে যুক্ত ছিলেন। দ্বারকানাথ বিদ্যাভুষণের সম্পাদনায় 'সোমপ্রকাশ' নামে যে পতরিকাটি প্রকাশিত হয় তার পরিকল্পনা রচনাবিদ্যা সাগরের অনবদ্য সৃষ্টি। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর যখন 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকা উঠে যাচ্ছিল তখন বিদ্যাসাগর ই অগ্রণী হয়ে কাগজটি বাঁচিয়ে ছিলেন।

(৭) বর্ণপরিচয় ও বিদ্যাসাগর

১৮৫৫ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় এক অনবদ্য সৃষ্টি। তিনি বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী। এই শিল্প কর্মশালার একটি অনবদ্য সৃষ্টি হল বিদ্যাসাগরের প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং শিক্ষার্থীদের জন্য লেখা বর্ণপরিচয় তিনি উপলব্ধী করে ছিলেন শুধু বিদ্যায় স্থাপনই উপযুক্ত দক্ষতা নয়। শিশু মনের বিকাশের ক্রম অণুযায়ী বাংলা ভাষার পরিবেশনে উপযুক্ত দক্ষতা চাই। তাই তার শিশু বিকাশের শ্রেষ্ঠ উপহার হল বর্ণপরিচয়।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
75

(ক) বর্ণ পরিচয়ের বিষয়বস্তু :

বর্ণপরিচয়ের মাধ্যমে বিদ্যাসাগর শিশুমনের প্রথমভীত গঠনের দিককে তুলে ধরেছেন। শিশুদের অক্ষর পরিচয় থেকে শুরু করে। স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, বর্ণযোজনা, শব্দ, বাক্য ও ছোট ছোট অনুচ্ছেদ ক্রম বর্তমান ধারায় সরল থেকে জটিল বিশেষ পর্যায়ে তুলে ধরেছেন।

টিপ্পনী

(খ) বর্ণপরিচয় ও ভাষা বিকাশ :

বাংলায় অপ্রয়োজনীয় সংস্কৃত অক্ষরের ব্যবহার যেমন দীর্ঘ তেমনি ভাষার ব্যবহর ও দুর্বোধ্য । তিনি সর্বপ্রথম বাংলাভাষাকে পৃথক ভাবে সাধুভাষা ও চলিত ভাষার ব্যবহার করলেন । বাংলা ভাষার মধ্যে বিশেষ্য, বিশেষন, ক্রিয়া বিশেষণের ইত্যাদির ব্যবহারকে মনোস্তত্ত্ব নির্ভর ও ভাষা বিজ্ঞান নির্ভর করলেন । উচ্চারণ ও পরিবর্তন করলেন।

(গ) বর্ণপরিচয় ও বাংলা হরফ :

ছোট ছোট শিশুদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে তিনি বাংলা হরফের রূপের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের যে রূপ তা পরিচয় করলেন। তেমন ভাবে শব্দ সমষ্টি দিয়ে বাক্য রচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থি যাতে নিজের বক্তব্যকে উপস্থাপিত করতে পারে এবং শব্দের সু-ললিত বিন্যাস বা বক্তব্যকে পাঠকের মধ্যে গেঁথে দিতে পারে তার দিক নির্দেশ করলেন।

(ঘ) বর্ণপরিচয় ও নীতির উপদেশ

বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্ণপরিচয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে বিভিন্ন বস্তু তুলে ধরলেন । ১৮৫৫ সুসম্পন্ন বর্ণপরিচয় প্রকাশিত হল । তিনি এই পুস্তককে ঈশপ, Fablus, পুরাণ প্রভৃতি বিষয় বাছাই করে সরলাকারে বাংলা ভাষার শিক্ষার্থীদের সামনে পরিবেশন করলেন। বর্ণপরিচয়ের লেখা গুলিতে তিনি নীতিবোথ ও মূল্য বোধ সংক্রান্ত দিকগুলিকে তুলে ধরেছেন । তার লেখা নৈতিক মূল্যবোধ সংক্রান্ত অন্যান্য পুস্তক গুলি হল - বোধদয়, কথামালা, মঞ্জুরী, প্রভৃতি।

(ঙ) বর্ণপরিচয়ের শিক্ষাগত গুরুত্ব

বিদ্যাসাগরের সৃষ্টি বর্ণপরিচয় শিক্ষার্থীদের যে রূপ অক্ষর পরিচয় করায়, ভাষা জ্ঞান বৃদ্ধি করে তেমনি শিশুদের বৌদ্ধিক, মানসিক, নৈতিক জীবন গঠনের উদ্দেশ্যে ও শিক্ষার দ্বারা সামাজিক রূপান্তরের তিনি সংস্কার বিবর্জিত ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষার প্রথম সোপানটি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করলেন । রুশোর মতে তাঁর রচিত বর্ণপরিচয় হল একটি 'শিশু সনদ'।

(৮) বিদ্যাসাগর ও সংস্কৃত কলেজ :

এই কলেজে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা শুধু একজন শিক্ষক বা শিক্ষা প্রশাসনের নয়, তার ভূমিকা ছিল শিক্ষা সংস্কার ও তার মধ্য দিয়ে সমাজ সংস্কারকে অগ্রদূত হিসাবে যুক্তিবাদ, উপযোগীতাবাদ, মানবতাবাদ, বা জীবনের নির্যাস তিনি কখনও গতানুগতিকতাকে মেনে নিতে পারেন না।

(ক) সংস্কৃত কলেজ ও বিদ্যাসাগরের কর্মসূচী

১৮৪৬ সালে সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগর সহকারী সম্পাদকের পদে যোগদেন। ইতিমধ্যে তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থেকে তিনি যে শিক্ষা সংস্কার মূলক চিন্তা ভাবনা কেছিলেন তাঁরই প্রেক্ষিতে এই সংস্কৃত কলেজ পঠন পাঠন পাঠক্রম পদ্ধতি এমন কী প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের জন্য একটি কর্মসুচী তৈরীকরেন। তার কর্মসূচির সম্পাদক ছিলেন রসময় দত্ত। বিদ্যাসাগরের কর্মসূচির সমগ্র দিক গ্রহণ যোগ্যহলেও সম্পাদক তা প্রত্যাখ্যান করেন। এর এক বছর পর বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সচীব পদ সরিয়ে নিলেন।

টিপ্পনী

(খ) বিদ্যাসাগর ও সৃষ্টিশীল কাজ

তিনি সংস্কত কলেজে সৃজনমূলক কাজে নিয়োগ করেন। তাঁর লেখা গ্রন্থগুলির মাধ্যমে সৃজনশীলতার প্রকাশ পাই। তিনি মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সঙ্গে সংস্কৃত পুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশনা জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেন। সম্পাদক রসময় দত্তের পদত্যাগের ফলে তাঁর এই সৃজনত্মক কাজে ভাটা পড়ে যায়।

(গ) সংস্কৃত কলেজ ও মাতৃভাষা :

সংসকৃত কলেজের কর্মকালে তিনি উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মার্তভাষার কথা বলেছেন। ১৮৫৪ সালে বাংলার গর্ভনর জেনারেল হ্যানিতেকে বাংলা বিষয় সম্পর্কে বিশেষভাবে লিখলেন। অর্থাৎ কলেজীয় স্তরে তথা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মার্তৃভাষাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর গতানুগতিক মুখস্ত বিদ্যার উপর গড়ে ওঠা শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা করেছিলেন। তিনি শিক্ষার আত্তীকরনের জন্য অনেক বই লিখেছেন। পরীক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের উদ্যোগী হয়েছেন। এছাড়া তিনি সংস্কৃত কলেজে বেতন প্রথা, গ্রীষ্মকালিন অবকাশ প্রবর্তন করেছিলেন। বিদ্যাসাগর যথার্থই সিন্ধু ও করুনার সাগর রূপে পরিচিত।

অনুশীলনী

১। শিক্ষা তথা সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে সুবিশাল কর্মপ্রচেষ্টায় ঈশ্বচন্দ্র বিদ্যাসাগর একঅনন্য সাধারণ ব্যাক্তিত্ব - আলোচনা কর।

২।আমাদের দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে রামমোহন রায়ের ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

৩। বাংলার নব জাগরণের মূল বিষয়গুলি উল্লেখ কর।

টিপ্পনী

তৃতীয় একক

হান্টার কমিশন

টিপ্পনী

নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্যাবলী

এইঅধ্যায়ের শেষে শিক্ষার্থীরা-

১। হান্টার কমিশনের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে বলতে সক্ষম হবে।

২ ।হান্টার কমিশনের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রম সম্পর্কে ধারনা লাভ করবে।

৩। হান্টার কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে।

৪। হান্টার কমিশনের শিক্ষক সম্পর্কে বলতে সক্ষম হবে।

সূচনা

সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী সময়ে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় 'ধর্মনিরপেক্ষনীতি' চলাকালীন মিশনারী অসন্তোষ ও ১৮৭৮ সালে ইংল্যান্ডে গঠিত "General Council of education in India" দ্বারা সংগঠিত আন্দোলেনর প্রাককালে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে অচলাবস্থা বিরাজ করেছিল এরকম সময়ে দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য তৎকালীন বড়লাট লর্ড রিপন ১৮৮২ - ৮৩ সালে ২০ সদস্য নিয়ে বড়লাটের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য Sir William Hunter এর সভাপতিত্বে যে কমিশন গঠন করেন তা ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে 'Hunter Commission' নামে পরিচিত।

এই কমিশনের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে আনন্দমোহন বসু, ভুদেব মুখোপাধ্যায়, মহারাজ যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জাস্টিস কে, সৈয়দ মামুদ, তেলাং প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

এই কমিশনের সদস্যরা সারা ভারত ঘুরে একবছর বাদে অর্থাৎ ১৮৮৩ সালে ২২২টি প্রস্তাব সহ ৬০০পৃষ্ঠার এক বিরাট রিপোর্ট সরকারের কাছে জমা দেয়।

কমিশনের বিচার্য বিষয়

তৎকালীন ভারতে শিক্ষার ইতিহাসে চরম বিশৃঙ্খলাময় পরিস্থিতিতে এই কমিশনের বিচার্য বিষয়গুলি হল

(ক) Wood's Despatchএর সুপারিশগুলি কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে তা পর্যালোচনা করা।

(খ) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি দেখা।

(গ) ভারতে শিক্ষার অর্থাৎ জনশিক্ষার প্রসারের কাজ কী কী কারনে অগ্রসর হতে পারেনি তা দেখা।

টিপ্পনী

(ঘ) Grant-in-Aid প্রথার আরোপ বিস্তার সাধনে জোড় দেওয়া।

প্রাথমিক শিক্ষা (Primary Education)

কমিশন গণশিক্ষার ভিত্তি রচনার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাই প্রাথমিক শিক্ষাকে উপেক্ষা করে জাতীয় শিক্ষা গড়ে উঠতে পারে না। তাই প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কমিশন বলেছেন -"প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা ও সম্প্রসারনের জন্য রাষ্ট্রের দিক থেকে সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করা উচিত এবং প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রদেশের চাহিদা অনুযায়ী আইনের সাহায্য নেওয়া উচিত।"

কমিশনের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে সুপারিশগুলি হল -

(১) উদ্দেশ্য

কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যে সম্পর্কে বলেছেন

(ক) আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সরকার ও জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে।

(খ) প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

(গ) কোন প্রতিষ্ঠানে অশিক্ষিত ব্যাক্তির তুলনায় অল্প শিক্ষিত ব্যাক্তি নিয়োগ করা শ্রেয় হবে।

(ঘ) একে স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষার স্তর হিসাবে বিবেচনা করেছেন।

(২) সংগঠন গত দিক

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
80

সংগঠনগত দিক সম্পর্কে বলা হয় -

(ক) প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলিকে সরকারী স্বীকৃতি দান।

(খ) জাতি, ধর্ম,বর্ণ নির্বিশেষে ছাত্র ভর্তি করতে হবে।

(গ) এই শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুন্নত অঞ্চল ও জনসমষ্টির প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে।

(ঘ) ভারতীয়দের মধ্য থেকে বিদ্যালয় পরিদর্শক নিয়োগ করতে হবে।

(৩) পাঠক্রম

(ক) স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী হবে।

(খ) পাঠক্রমে দেশীয় গণিত, জরিপ, হিসাব, ভৌত বিজ্ঞান, শিল্পকলা, কৃষিবিদ্যা ইত্যাদি থাকবে।

(গ) পাঠক্রম নির্ধারণ ও পুস্তক নির্বাচনের ব্যাপারে পরিচালকদের স্বাধীনতা দিতে হবে।

টিপ্পনী

(৪) পরিচালনা

(ক) বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যাপারে কমিশন স্থানীয় কতৃপক্ষের অধীনে Board গঠনের কথা বলেছেন।

(খ)এই স্থানীয় কতৃপক্ষের দ্বারা স্কুলের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ পরিচালিত হবে।

(৫) শিক্ষার মাধ্যম

(ক) এই শিক্ষার ক্ষেত্রে মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষার কথা বলেছেন।

(খ) বিভিন্ন ভাষাভাষি সম্প্রদানের মধ্যে থেকে ছাত্র ছাত্রী শিক্ষার দাবী করলে তার জন্য কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(৬) পরীক্ষা গ্রহণ

(ক) পরিদর্শকরা পরীক্ষা গ্রহণ করবেন।

(খ) দেশীয় শিক্ষারীতির কথা স্মরণ রেখে পরীক্ষা ব্যবস্থার পরিচালনা করতে হবে।

(৭) অর্থ

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অর্থের যোগান সম্পর্কে বলা হয়েছে -

(ক) প্রত্যেক জেলা ও Municipal Board প্রাথমিক শিক্ষার পৃথক তহবিল গঠন করবে।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

(খ) প্রদেশিক সরকার শিক্ষার এক তৃতীয়াংশ বহন করবেন।

(গ) প্রাথমিক রাজস্ব আয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যায় হবে।

(ঘ) দরিদ্র ছাত্র ব্যাতীত অন্যদের থেকে অর্থ নিতে হবে।

টিপ্পনী

(৮) শিক্ষক শিক্ষা

(ক) প্রত্যেক মহকুমা পরিদর্শকের তত্ত্বাবধানে অন্ততঃত একটি করে শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয় থাকবে।

(৯) অন্যান্য সুপারিশ

(ক) দৈহিক স্বাস্থের উন্নতির জন্য ছাত্রদের ব্যায়াম, স্কুল ড্রিল ও দেশীয় খেলাধূলায় উৎসাহিত করতে হবে।

(খ) স্কুল বসার ও ছুটির সময় স্থানীয় প্রয়োজন অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

(গ) স্কুলের শৃঙ্খলা রক্ষা ও চরিত্র গঠনের দিকে বিদ্যালয় পরিদর্শকদের দৃষ্টি রাকতে হবে।

(ঘ) প্রাথমিক শিক্ষায় উৎসাহিত করার জন্য কাজে অশিক্ষিত তুলনায় অল্প শিক্ষিত ব্যাক্তিদের নিয়োগ করতে হবে।

(১০) ফলশ্রুতি

(ক) প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যাস্ত হবার ফলে স্থায়ত্ব শাসন আইন বলবৎ হয়।

(১১) সমালোচনা

(ক) এই শিক্ষা কমিশন দেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে বিধিবদ্ধ করার কথা বলেছেন কিন্তু অবৈতনিক বিধিবদ্ধ করার কথা বলেন নি।

(খ) শিক্ষার ব্যায়ভার প্রাদেশিক সরকার কোথা থেকে পাবে তার কোন সুনির্দিষ্ট মতামত পোষন করা হয় নি।

(গ) প্রাদেশিক সরকার শিক্ষায় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে তীব্র সমালোচনা করার সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা পরীক্ষাকেন্দ্রীক হয়ে ওঠে।

মন্তব্য

এই কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে যে সমস্ত সুপারিশগুলি করেছে তা ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তা হলেও বলা যায় এই শিক্ষায় দেশের স্থায়ত্ব শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার দরুন তা দুঃনীতি পরায়ন ও ব্যর্থতার পর্যবসতি হয়ে পরে।

মাধ্যমিক শিক্ষা (Madhyamik Education)

প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি কমিশন তাদের অনুসন্ধান ভিত্তিক তথ্যাবলী বিশ্লেষন করে দেশের মাধ্যমিক শিক্ষায় প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে, কমিশন উপলব্ধী

করেছিলেন যে মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তাকে যদি সু-সংহত শিক্ষা ক্ষেত্রের সমস্যা গুলিকে সমাধান করা যাবে। কমিশন দেশের প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষার সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার জন্যে কতগুলি সুপারিশ করেছেন -

(১) উদ্দেশ্য

প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সরকার অধিকতর দায়িত্ব গ্রহণের ফলে মাধ্যমিক শিক্ষায় প্রত্যক্ষা সরকারি হস্তক্ষেপের পরিবর্তে 'অপসারন -নীতি' প্রয়োগ ও সাহায্য সহায়তা ও সাধারণের চেষ্টার দ্বারা শিক্ষা বিস্তারই সরকারের উদ্দেশ্য বলে ঘোষিত হয়েছিল।

টিপ্পনী

(২) সরকারী নিয়ন্ত্রনহ্রাস

কমিশন বলেছিলেন দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলির দায়িত্ব সরকার ধীরে ধীরে বেসরকারী দায়িত্বশীল পরিচালক মন্ডলীর হাতে তুলে দেবেন।

(৩) সরকারী বিদ্যালয়

(ক) বেসরকারী পরিচালিত মাধ্যমিক বিদ্যালয় গুলির মান না কমার জন্য প্রতিটি জেলায় একটি করে উন্নতমানের আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

(খ) এই আদর্শ বিদ্যালয়গুলি বেসরকারী প্রচেষ্টার সামনে মডেল হিসাবে উপস্থাপন করা হবে।

(৪) সুযোগ সুবিধা

(ক) এক্ষেত্রে সরকার উদার সাহায্য দানের নীতি গ্রহণ করবে।

(খ) বেসরকারী বিদ্যালয়গুলিকে সরকারী পর্যায়ের সমান সুযোগ সুবিধা দিতে হবে।

(৫) অনুন্নত অঞ্চলের জন্য বিদ্যালয়

(ক) অনুন্নত অঞ্চলে সরকারী সাহায্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

(খ) এই সব অঞ্চলের বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব সরকার বহন করবে।

(৬) বেতন

(ক) বেসরকারি প্রচেষ্টায় আরও অধিক সংখ্যক মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

(খ) স্থানীয় পরিচালন সমিতিকে নিজ নিজ বিদ্যালয়ের বেতন নির্ধারনের স্বাধীনতা দিতে হবে।

টিপ্পনী

(৭) শিক্ষার মাধ্যম

(ক) মাধ্যমিক শিক্ষার মিডিল স্তর অর্থাৎ (ষষ্ঠ শ্রেণী) পর্যন্ত প্রাদেশিক সরকার তাদের নিজ নিজ এলাকার শিক্ষার মাধ্যমিক করবেন।

(খ) এর পরবর্তী পর্যায়ে কমিশনের এ বিষয়ে আশ্চর্যজনক ভাবে নিশ্চুপ থেকেছে।

(৮) পাঠক্রম

(ক) অষ্টম শ্রেনী পর্যন্ত শিক্ষার পাঠক্রম ছিল একমুখী অর্থাৎ এখানে সকলে সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, কিছু বিজ্ঞান শিক্ষা গ্রহণ করত।

(খ) অষ্টম শ্রেণীর পরবর্তী সময়ে পাঠক্রমকে দুটি ভাগে ভাগ করা হবে অর্থা A Course ও B Course।

(গ) A course এর পাঠক্রম সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পের উপযোগী সাহিত্যধর্মী।

(ঘ) B-Course এর পাঠক্রম সাধারণত পুঁথিবিদ্যা বর্জিত ব্যবহারিক শিক্ষার উপযোগী।

(৯) শিক্ষক শিক্ষণ

(ক) শিক্ষক শিক্ষণের বিষয়ে কমিশন বলেছিলেন এই শিক্ষক শিক্ষণ ব্যাতীত কোন শিক্ষককে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা চলবে না।

(খ) শিক্ষক নিয়োগের পূর্বে শিক্ষাতত্ব ও শিক্ষনতত্ত্ব সম্পর্কে পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।

সমালোচনা

(ক) মাধ্যমিক স্তরে দ্বিমুখী শিক্ষার কথা বলা হলেও প্রকৃত পক্ষে সাহিত্যধর্মী পাঠসূচীই চালু ছিল।

(খ) কিছু কিছু সরকারী স্কুল ব্যাতীত অন্য সব ক্ষেত্রে B-Course এর পাঠক্রম ব্যাতীত হয়েছিল।

(গ) মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে কমিশন পরিবর্তণ পালন করেছিল।

(ঘ) মাধ্যমিক শিক্ষার আলোচনা অসম্পূর্ণ ছিল।

(ঙ) কমিশনের শর্তানুসারে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরকে দ্বিবিভক্ত করা হয় নি।

(চ) মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্র সরকারী সহযোগী তার কথা বলা হলেও তা করা হয়নি।

মন্তব্য

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা বলা যায় কমিশনের সুপারিশ অনুসারে মাধ্যমিক শিক্ষায় বেসরকারীকরণ, মডেল বিদ্যালয় স্থাপন, পাঠক্রমকে A Course ও B-course এ ভাড়া করা এই সমস্ত কিছু মাধ্যমিক শিক্ষাকে তার প্রকৃত রূপদানের পাশাপাশি দেশের বর্তমান শিক্ষার ক্ষেত্রে এক অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই ক্ষেত্রে বলা যায় Hunter commission এর সুপারিশ ভারতীয় দের চির কৃতজ্ঞের আসনে অধিষ্ঠিত করবে।

টিপ্পনী

অনুশীলনী

১। হান্টার কমিশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২। হান্টার কমিশনেপ্রাথমিকও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে লেখ।

(৩) হান্টার কমিশনের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে উদ্দেশ্য, পাঠক্রম, পরীক্ষা গ্রহণ, শিক্ষক স্তর উল্লেখ কর।

টিপ্পনী

কার্জনের শিক্ষাসংস্কার (১৮৯৮- ১৯০৪)

টিপ্পনী

নির্দেশনা মূলক উদ্দেশ্যাবলী

এই অধ্যায়ের শেষে শিক্ষার্থীরা

১। কার্জনের শিক্ষানীতি সম্পর্কে বলতে সক্ষম হবে।

২। কার্জনের মাধ্যমিক স্কুলের মান উন্নয়নের সম্পর্কে ধারনা লাভ করবে।

৩। কার্জনের বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে।

১৮৯৮ সালে লর্ড কার্জন ভারতবর্ষের বড়লাট হয়ে আসেন। তিনি সমগ্র শিক্ষাক্ষেত্রের আনুপূর্বিক তথ্য সংগ্রহ করলেন এবং শিক্ষাসংস্কারের কাজে হাত দেবার আগে শিক্ষার সমস্যা সম্পর্কে বিশদ পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে ১৯০১ সালে সিমলায় এক শিক্ষা সম্মেলন আহ্বান করলেন। শিক্ষা সম্পর্কে সর্বভারতীয় সম্মেলন সেই প্রথম এবং সে বিষয়ে সকলের মনে গভীর আগ্রহ ও কৌতুহলীর সৃষ্টি হল। এই সম্মেলনে কার্জন সমস্ত প্রদেশের শিক্ষা ডিরেক্টর এবং বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট কয়েকজন শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জানালেন। দীর্ঘ ১৫ দিন আলোচনার মধ্যে এই সম্মেলনে শিক্ষাসংস্কার সংক্রান্ত ১৫০টি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং পরবর্তীকালে লর্ড কার্জন এইসমস্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতেই ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারে উদ্যোগী হন।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন - ১৯০২

১৮৮২ সালের হান্টার কমিশন বিশ্ববিদালয়গুলির সুসংস্কার ও পুর্নগঠন সম্পকে সুনির্দিষ্ট কোন অভিমত প্রকাশ করেন নি। কলেজও মাধ্যমিক স্কুল গুলির দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছিল বলে বিশ্ববিদ্যালয় গুলির শিক্ষা মানের অবনতি ঘটেছিল। অতঃপর এই সকল বিবিধ কারণে এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কার সাধনের কাজটি প্রথম গ্রহণ করে লর্ড কার্জন সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছিলেন এই উদ্দেশ্যে ১৯০২ সালে তিনি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যলয় কমিশন নিয়োগ করেন।

কমিশনের সুপারিশ

এই কমিশন কতকগুলি মূল্যায়ন সুপারিশ করেন।

(ক) বিশ্বিদ্যালয় গুলির আইনগত ক্ষমতা বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয় এবং নিম্নস্নাতক পর্যায়ের শিক্ষাদানের দায়িত্ব কলেজ গুলির হাতেই রাখার প্রস্তাব করা হয়।

টিপ্পনী

(খ) কেবলমাত্র স্নাতোকত্তর (Post Graduate) পর্যায়ের শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব শিক্ষক নিয়োগের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।

(গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব গ্রন্থাগার, গবেষনাগার এবং উপযুক্ত ছাত্রাবাস নির্মানের স্বপক্ষে কমিশন দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিচালনা ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে এই কমিশন প্রস্তাব করেন যে সেনেটের সদস্য সংখ্যা হ্রাস করতে হবে এবং কোনও ব্যাক্তি ৫বৎসরের বেশী সদস্য থাকতে পারবেন না। সিন্ডিকেটের সদস্য সংখ্যা হবে ৯ থেকে ১৫জনের মধ্যে এবং এঁরা সেনেট কর্তৃক নির্বাচিত হবেন।

ভারতীয় বিশ্ব বিদ্যালয় আইন - ১৯০৪

১৯০২ সালের বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন তাদের বিবরণী পেশ করার পরে ১৯০৪ সালে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইনটি বিধিবদ্ধ হয়।

এই আইনটির উল্লেখযোগ্য বিধিগুলি ছিল -

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিয়োগ এবং গবেষনা, গ্রন্থাগার ওছাত্রাবাস পরিচালনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসূচী বিস্তৃত করা হবে।

(২) সেনেটের সদস্য সংখ্যা সীমাবদ্ধ করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০ জনের কম বা ১০০ জনের বেশী 'ফেলো' থাকবেন না এবং কোন 'ফেলো' আজীবন সদস্য থাকতে পারবেন না। তাঁদের কর্মকাল হবে ৫ বৎসর। ১০০ জন সদস্যের মধ্যে ৮০ জনকেই সরকার মনোনীত করবেন।

(৩) পুরানো বিশ্ববিদ্যলয় গুলিতে ২০ এবং নতুন দুটি (পাঞ্জাব ও এলাহাবাদ) বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫ জন করে নির্বাচিত 'ফেলো'র সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয়ে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক প্রতিনিধির আসনের ব্যবস্থা করে সিন্ডিকেটকে আইনানুগ অনুমোদন দেওয়া হবে।

(৫) বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনির্দিষ্ট অনুমোদন লিপিবদ্ধ হবে এবং কলেজ গুলির যাতে নিয়মিত পরিদর্শন হয় এবংঅনুমোদনের পূর্বে সরকারী অনুমতি নেওয়া হয় সে বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হবে।

(৬) সেনেট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আইনকে কার্যে পরিণত করতে না পারলে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনের জন্য, এমন কি নতুন নিয়মকানুন প্রণয়নের ব্যাপারেও সরকারী কর্তৃপক্ষকে আইনসঙ্গত ক্ষমতা অর্পন করা হবে। ১৮৫৭ সালের আইনে সরকারকে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়নি।

শিক্ষণধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্তন

১৯০৪ সালের বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের সবচেয়ে বড় অবদান হল বিশ্ববিদ্যালয় গুলিকে শিক্ষণধর্মী করে তোলা। ১৯৮৮ সালের আইনের বলে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়টি অনুমোদনধর্মী (Offiliating) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষণধর্মী (Teaching) বিশ্ববিদ্যালয়ে রুপান্তরিত হয়ে যায়। ভারতবর্ষে ১৯০২ সালের কমিশনে এবং ১৯০৪ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইনে লন্ডণ বিশ্ববিদ্যালয় সংঠনের নীতিরই অনুসরণ করা হয় এবং ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গুলিকে শিক্ষণধর্মী বিশ্ববিদ্যালয় রূপে গড়ে তোলার নির্দেশ দেওয়া হয়।

টিপ্পনী

মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার

গ্রান্ট-ইন এড প্রথার প্রবর্তনের পর থেকেই মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারী প্রচেষ্টা অবাধগতিতে বিস্তার লাভ করেছিল। মাধ্যমিক স্কুল সংখ্যায় বহু হলেও কার্যকারিতার দিক দিয়ে তাদের মূল্য বিশেষ ছিল না। মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর নীতি দুটি কথায় প্রকাশ করা যায়, সংখ্যাগত সংকোচন ও গুনগত উন্নয়ন অর্থাৎ শিক্ষার বিস্তারের নিয়ন্ত্রণ ও শিক্ষার মানের উন্নয়ন।

স্কুল অনুমোদন

মাধ্যমিক শিক্ষায় অবাঞ্ছিত বৃদ্ধি রোধ করার জন্য কার্জন স্কুল গুলিতে অনুমোদন প্রথার প্রবর্তন করলেন। ১৯০৪ সালের সরকারের শিক্ষাণীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবে (Government Resolution on Education policy of 1904) সেই নীতি পরিত্যাগ কে সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী স্কুলগুলির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। সেই নীতি অনুসারে স্কুল অনুমোদনের শর্তাদি রচনা করা হল।

স্কুলগুলির উপর দুপ্রকারের অনুমোদন প্রথা বলবৎ হল। প্রথমত, শিক্ষাবিভাগের এবং দ্বিতীয়তম বিশ্ববিদ্যালয়ের। এই দ্বিবিধ অনুমোদন প্রথার ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার বাধাহীন প্রসার বিশেষভাবে খর্ব হয়ে গেল। এই যুগ্ম অনুমোদন প্রথার প্রবর্তনে সে অসুবিধা কিছুটা দুর হল। শিক্ষা বিভাগের অনুমোদিত স্কুলগুলি নিম্নলিখিত সুযোগ সুবনিধা পাওয়ার অধিকারী হল -

(১) সরকারি গ্রান্ট-ইন-এড লাভ।

(২) সরকারী পরীক্ষাগুলিতে ছাত্র প্রেরণ।

(৩) সরকারী ছাত্রবৃত্তিভোগী ছাত্রদের গ্রহণ।

টিপ্পনী

মাধ্যমিক স্কুলের মান উন্নয়ন

কার্জন একদিকে যেমন মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার ও পরিচালনার ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ন্ত্রণের প্রচলণ করলেন। তেমনি অপরদিকে প্রচলিত School গুলির শিক্ষর মানের যাতে যথেষ্ট উন্নতি হয় তার জন্যও সচেষ্ট হন তার এই নীতিকে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে তিনি ৩টি প্রধান উপায় অবলম্বন করলেন -

(১) সরকারী উচ্চ School গুলিকে আদর্শ বা 'মডেল' School রুপে পরিচালনা করা হবে। শিক্ষাক্ষেত্রের প্রত্যেক শাখায় সরকারী প্রচেষ্টা অক্ষুন্ন রাখতে হবে এবং প্রত্যেক জেলায় অন্তত একটি করে সরকার পরিচালিত আদর্শ মডেল উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

(২) বেসরকারী School গুলি যাতে সরকারী মডেল School এর মত উন্নতিতে পৌঁছতে পারে তার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রান্ট-ইন-এড বিতরণের আয়োজন করা হবে।

(৩) মাধ্যমিক School এর শিক্ষকদের উপযুক্ত শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রতি কার্জণ অধিকতর মনোযোগ দিলেন। ১৯০৪ সালের শিক্ষানীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবে তিনি নির্দে দিলেন যে শিক্ষক -শিক্ষণ কলেজ গুলিকে উন্নত করে শিক্ষণপ্রাপ্ত মাধ্যমিক শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে এবং তার জন্য সরকারকে অগ্রণী হতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কার্জনের নীতি ছিল বেশ স্বতন্ত্র। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র গুণগত মান উন্নয়নের প্রতি তিনি মনোযোগ দিয়েছিলেন এবং পরিমাণগত বৃদ্ধির সংকোচন করেছিলেন।

১৮৮২ সালের পর থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সরকারী অর্থ সাহায্যের অভাবে বিশেষ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কার্জন এইকারণে বিপুল পরিমানের এককালীন (Non - recurring) ও পৌনঃপুনিক (Recurring) অর্থ সাহায্য দান করেন। ১৮৮১ -১৮৮২ সালে প্রাথমিক School এর সংখ্যা ছিল প্রায় ৮৩০০০, ১৯০১ - ১৯০২ সালে হল প্রায় ৯৪০০০ এবং ১৯১১ - ১৯১২ সাল দাঁড়াল প্রায় ১১৮০০০ এরও বেশী। ছাত্র সংখ্যাও দ্বিগুন বৃদ্ধি পেয়েছিল।

কার্জনের শিক্ষানীতির মূল্যায়ন

লর্ড কার্জনের শিক্ষানীতি সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে হলে তাঁর প্রকাশিত শিক্ষা-নীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবটি ভাল করে পড়া দরকার এই প্রস্তাবেই তাঁর শিক্ষানীতি পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

শিক্ষানীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব

লর্ড কার্জনের শিক্ষানীতি গুলি একটি সরকারী প্রস্তাবের (Resolution of EducationPolicy)রূপে ১৯০৪ সালের ১১ই মার্চ প্রকাশিত করেন।

ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে কার্জনের অবদান

ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে কার্জনের প্রধান অবদান গুলি হল -

প্রথমত : কার্জনই ভারতীয় শিক্ষার মানের উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তাবোধ করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। পাঠক্রমের উন্নয়ন, মাতৃভাষার স্বীকৃতিদান, বিজ্ঞানচর্চার প্রবর্তন ইত্যাদি সংস্কার মূলক কাজের দ্বারা কার্জনই ভারতীয় শিক্ষার পরবর্তীকালে উন্নয়ন ও সংস্কারের বীজ বপন করেন।

দ্বিতীয়ত : শিক্ষারক্ষেত্রে যে সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে এ ব্যাপারটিও কার্জন বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত করে যান । তার এই নীতির ফলেই পরবর্তীকালে সরকারকে শিক্ষার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা যায়।

তৃতীয়ত : সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও কৃষি, যন্ত্রবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, বাণিজ্যশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষার প্রসারের জন্যও তিনি ব্যবস্থা করেন।

চতুর্থত : কার্জণ বিশ্ববিদ্যালয় পরিশাসন ব্যবস্থার সংস্কার করে এবং বিশ্ব বিদ্যালয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থার প্রবর্তন করে তাতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করে যান।

অনুশীলনী

১ । ১৯০৪ সালের শিক্ষাপ্রস্তাবে লর্ডকার্জন ব্রিটিশ সরকারের ভারতে শিক্ষানীতির মধ্যে কি নতুনত্ব এনেছিলেন ? ১৯০৪ সালের শিক্ষা প্রস্তাবের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর।

২। লর্ড কার্জনের শিক্ষানীতির মূল্যায়ন কর।

৩। ১৯০৪ সালের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইনের প্রধান ধারাগুলি বর্ণনা কর।

৪। ১৯০২ সালের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (রাধাকৃষ্ণন কমিশন) সুপারিশগুলি বর্ণনা কর। পরবর্তীকালে ভারতীয় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এই সুপারিশ গুলির কি প্রভাব বিস্তার করেছিল বর্ণনা কর।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বা স্যাডলার কমিশন(১৯১৭)

টিপ্পনী

নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্যাবলী

এই অধ্যায়ের শেষে শিক্ষার্থীরা -

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যলয়ের উৎপত্তি সম্পকে বলতে সক্ষম হবে।

২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের গুরুত্ব সম্পর্কে ধারনা লাভ করবে।

৩ ।কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশ গুলির বাস্তব রূপায়ন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে।

সুচনা

১৯১৩ সালে যে সরকারী শিক্ষা প্রস্তাবটি গৃহীত হয় তাতে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় গুলির শিক্ষাসংস্কর ও প্রসার সম্পর্কে মূল্যায়ন নির্দেশ দেওয়া হয়। এই প্রস্তাবে ঘোষনা করা হয়েছিল যে প্রত্যেক প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা । বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে শিক্ষাদানের কাজের সম্প্রসারন করা এবং মফঃস্বলের কলেজ গুলিকে শিক্ষণধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবর্তিত করা প্রয়োজন। কিন্তু নানা কারণে ১৯১৩ সালের কোন প্রস্তাবই বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হয়নি।

মাধ্যমিক ও ইন্টারমিডিয়েট বোর্ড

(১)মাধ্যমিক ও ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ও ক্ষমতা একটি মাধ্যমিক ও ইন্টারমিডিয়েট বোর্ডের হাতে অর্পণ করা উচিত । এই বোর্ড সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চস্কুল ও ইন্টারমিডিয়েট কলেজ গুলির প্রতিনিধিরা থাকবেন।

(২) ডিগ্রি কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাস গুলিকে পৃথক করে নিয়ে ইন্টামিডিয়েট কলেজ স্থাপন করা উচিত। এই নতুন ধরনের কলেজে কলা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং, শিক্ষাতত্ত্ব, কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পশিক্ষার আয়োজন থাকবে।

(৩) ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ের পাঠ শেষ করার পরই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভের যোগ্যতা অর্জণ করা যাবে। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ পরই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করার প্রথা বিলুপ্ত করা হবে।

টিপ্পনী

নতুন বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠন

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষ্যাব্যবস্থার দোষ ত্রুটি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে কমিশন মন্তব্য করেন যে, এখানে কলেজ ও তাদের শিক্ষার্থীদের সংখ্যা এত বেশী যে একটিমাত্র বিশ্ববদ্যালয়ের পক্ষে সেগুলির সুষ্ঠু পরিচালনা করা অসম্ভব। এ সম্পর্কে কমিশন সুপারিশ করেন -

(১) ঢাকায় একটি শিক্ষনধর্মী আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। (১৯২০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়)

(২) কলকাতায় শিক্ষাদানের যে সব সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় সেগুলিকে এমমনভাবে সুমন্বিত করতে হবে যাতে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রকৃত শিক্ষণধর্মী বিশ্ববিদ্যালয় রূপে গড়ে ওঠে।

(৩) মফঃস্বলের কলেজগুলিকে এমনভাবে সমুন্নত করতে হবে, যাতে স্থানীয় সর্বপ্রকার শিক্ষাসংক্রান্ত সুযোগ সুবিধার সমন্বয়ে সেগুলি এক একটি উচ্চশিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয় রূপে গড়ে ওঠে।

পরিচালনা

বিশ্ববিদ্যালয় গুলিকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে যথাসম্ভব সংক্রান্ত রাখার উদ্দেশ্যে কমিশন সুপারিশ করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান সংক্রান্ত বিষয়ে কলেজের শিক্ষকদের হাতে অধিকতর ক্ষমতা অর্পন করতে হবে। অন্যান্য বিষয়ের পরিচালনার ব্যাপারে সেনেট এবং সিন্ডিকেটের পরিবর্তে যথাক্রমে একটি ব্যাপক প্রতিনিধিমূলক কোর্ট (Court) এবং একটি ক্ষুদ্র কার্যকর পরিষদ (Executive Council) গঠনের পরামর্শ দেওয়া হয়। পাঠক্রম নির্ধারণ, পরীক্ষাগ্রহণ, ডিগ্রীদান প্রভৃতি শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে একটি অধিকতর ক্ষমতাশালী অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল (Academic Council)গঠনের জন্য কমিশন নির্দেশ দেন।

শিক্ষাদান

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সংক্রান্ত দোষত্রুটি দূরীকরণের উদ্দেশ্যে কমিশন সুপারিশ করেন যে সাহিত্য ধর্মী পাঠক্রম ছাড়াও বিবিধ প্রকারের কারিগরি শিক্ষার আয়োজন করতে হে। অপেক্ষাকৃত মেধাবী শীক্ষার্থীদের জন্য অনার্স পাঠক্রম প্রবর্তন করতে হবে। ব্যাক্তিগত পাঠ প্রস্তুতি (Tutorial) ও উন্নত গবেষনা পরিচালনার আয়োজন করতে হবে এক ভারতীয় ভাষার চর্চা ও প্রাচীন প্রাচ্য বিদ্যার চর্চার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষক শিক্ষণ

শিক্ষক শিক্ষণ সম্পর্কে কমিশন পরমর্শ দেন যে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পৃথক শিক্ষাবিভাগ (Deperment of Education) স্থাপন করতে হবে এবং বি-এ (পাশ) ও ইন্টারমিডিয়েট পাঠক্রম 'শিক্ষাতত্ত্ব'' নামে একটি নতুন বিষয় সংযোজিত হবে। বৃত্তিমূলক (Vocational) শিক্ষা বিষয়ে কমিশন বলেন যে ব্যবহারিক জ্ঞান ও যন্ত্রশিল্প বিজ্ঞান (Technical) সংক্রান্ত পাঠক্রমের প্রবর্তন করে দেশের শিল্পন্নতির যথযথ ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। শরীর শিক্ষা সম্পর্কে কমিশন দৃঢ়ভাবে এই অভিমত পোষন করেন যে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি করে ছাত্রকল্যাণ পর্ষদ এবং প্রত্যেক প্রদেশে একজন শারীর শিক্ষার ডিরেক্টর থাকবেন।

১৫-১৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত মেয়েদের জন্য বিশেষ পর্দা-স্কুল স্থাপন ও নারী শিক্ষার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বোর্ড গঠনের কথা উল্লেখ করতেও কমিশন বিস্মৃত হয়নি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের গুরুত্ব

১৮৮২ সালের হান্টার কমিশন বা ১৯০২ সালের লর্ড কার্জনের নিযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন, কেউই উচ্চশিক্ষার সমস্যা গুলির প্রতি সুবিচার করতে পারেন নি। তার কারণ হল প্রথম কমিশনের ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে এবং দ্বিতীয় কমিশনের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে মতামত দেওয়া তাদের অধিকার বহির্ভূত ছিল। কিন্তু মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক উভয় শিক্ষার স্তরই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের পর্যালোচনার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে তাঁরা উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে ব্যাপক ও বাস্তবধর্মী সুপারিশ করতে সমর্থ হন। যেমন, মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত রাখার ফলে মাধ্যমিক শিক্ষা যেমন একদিক দিয়ে তার স্বাতন্ত্র্য হারিয়েছিল এবং নিছক উচ্চশিক্ষার সোপান হয়ে দাঁড়িয়েছিল তেমনই অপর দিকে বিশ্ববিদ্যালয় ও অনভাবশ্যক পরিশাসনের বোঝায় ভারাক্রান্ত হয়ে সুষ্ঠু কর্মনির্বাহে অক্ষম হয়ে উঠেছিল। সেইজন্য মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিশাসন থেকে সরিয়ে আনার প্রস্তাবটি কমিশনের পক্ষে যে খুবই বিবেচনা প্রসূত হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মানের উন্নয়নের জন্য কমিশনের নির্দেশ গুলিও বিশেষ প্রগতিশীল ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যভার লাঘবের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের নির্দেশটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল। কমিশনের এই নির্দেশটি পালিতও হয়েছিল এবং তার ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের বোঝা অনেক কমে গিয়েছিল।

বিভিন্ন প্রাকৃতিক উন্নত স্তরের শিক্ষাদান ও গবেষনার আয়োজন করাই যে

টিপ্পনী

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত লক্ষ্য কমিশন তা উপলব্ধি করেছিলেন। সেইজন্য কমিশন যেমন একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর থেকে অনাবশ্যক পরিশাসনের দায়িত্ব অপসারণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে বহুমুখী উচ্চশিক্ষার পাঠক্রম প্রবর্তনের পরিকল্পনা করেছিল। এরই প্রস্তুতি রূপে কমিশন ইন্টারমিডিয়েট স্তরে কলা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, কারিগরি, শিক্ষা, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি বিভিন্ন বিশেষধর্মী পাঠক্রম প্রবর্তনের নির্দেশ দেন।

টিপ্পনী

সুপারিশ গুলির বাস্তব রূপায়ন

বলা বাহুল্য শিক্ষা কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার ফলে কমিশনের এই মূল্যবান সুপারিশ গুলির অধিকাংশই বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। ইন্টারমিডিয়েট পাঠস্তরটিকে স্বতন্ত্র বোর্ডের অধীনে আনার প্রস্তাবটির অনেকেই বিরোধিতা করেন। অনেকের মতে এর ফলে শিক্ষক সঙ্কট, বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ক্ষতি প্রভৃতি দেখা দেবে। তাছাড়া মাধ্যমিক ও ইন্টারমিডিয়েট বোর্ডের গঠন প্রণালী নিয়েও মতভেদ দেখা দিল।

অবশ্য কমিশনের সুপারিশ মত ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তার ফলে পূর্ববঙ্গের কলেজ গুলির দায়িত্ব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে আর বহন করতে হল না।

ভবিষ্যৎ তথ্যও নির্দেশনার উৎস

স্যাডলার কমিশনের অধিকাংশ সুপারিশ সে সময় বাস্তবে রূপায়িত না হলে ভারতের শিক্ষার ভবিষ্যৎ বিবর্তনের দিক দিয়ে সেগুলির বিশেষ মূল্য ছিল। এদিক দিয়ে এই কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে মেহিউর (Mayhew) মন্তব্য বিশেষ প্রনিধানযোগ্য। মেহিউ বলেন, 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের বিবরণটি তথ্য ও প্রস্তাবনার দিক দিয়ে একটি সর্বকালীন উৎস বিশেষ এবং ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে এর গুরুত্ব অপরিময়।'

প্রথমত : মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বার বৎসের পাঠস্তর প্রবর্তণ এবং শেষ দুই বৎসর বহুমুখী ও বৃত্তিমুখী করার নির্দেশ কমিশনই প্রথম দেন।

দ্বিতীয়ত : বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মানের উন্নয়ন ও বিভিন্নধর্মী পাঠক্রমের প্রবর্তনের ও অনুপ্রেরনা এই কমিশনের প্রস্তাব থেকে পাওয়া যায়।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
96

তৃতীয়ত : বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিশাসন ব্যবস্থার সংস্কার সাধন ও আধুনিকরণের প্রস্তাব ও সুনির্দিস্ট পরিকল্পনা এই কমিশনই দিয়েছিলেন।

চতুর্থত : বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বয়ংক্রিয়তা বা স্বাধীনতার ধারনাও এই কমিশনের নির্দেশ থেকেই পাওয়া যায়।

পঞ্চমত : শিক্ষার্থীর কল্যাণ মূলক ও সহপাঠ ক্রমিক কাজের পরবর্তনের

পরিকল্পনা ও এই কমিশনই দিয়েছিলেন।

ষষ্ঠত : তিন বৎসরের ডিগ্রীস্তর ও সাম্মানিক পাঠক্রম প্রবর্তনের প্রস্তাব এই কমিশনই প্রথম দেন।

এককথায় সাম্প্রতিক কালে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যেসব সংস্কার ও পরিবর্তনের প্রবর্তণ করা হচ্ছে তার অনেক গুলিই ৭০বছর আগে স্যাডলার কমিশন তাঁদের বিবরণীতে উল্লেখ করে যান।

টিপ্পনী

অনুশীলনী

১। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের (১৯১৭) মুখ্য সুপারিশগুলির বর্ণনা কর। এবং পরবর্তীকালে শিক্ষার সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে এই কমিশনের গুরুত্ব আলোচনা কর।

২। "কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের বিবরণটি নির্দেশ ও তথ্যের এক সর্বকালীন উৎস" (মেহিউ) - এই উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

টিপ্পনী

চতুর্থ অধ্যায়

রাধাকৃষ্ণন কমিশন

টিপ্পনী

এই অধ্যায়ের শেষে শিক্ষার্থীরা

(ক) রাধাকৃষ্ণণ কমিশন সম্পর্কে বলতে সক্ষম হবে।

(খ) গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে ধারনা লাভ করবে।

(গ) রাধাকৃষ্ণন কমিশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে।

ভূমিকা

ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি লাভের পর জাতীয় জীবনে আশা আকাঙ্খার কথা স্মরণ রেখে ভারত সরকার ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫ ই নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান এবং তার উন্নতির জন্যে স্বাধীন ভারতে প্রথম শিক্ষা কমিশন বা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন। এই কমিশন রাধাকৃষ্ণন কমিশন নামেও পরিচিত।

কমিশনের সদস্য

এই কমিশনের মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ১০ জন। এদের মধ্যে তিনজন বিদেশি শিক্ষাবিদ এবং সভাপতি সহ অন্যরা ভারতীয় শিক্ষাবিদ ছিলেন। বিদেশি সদস্যরা হলেন ড. জেমস এম ডাফ, ড. আর্থার ই মরগ্যান এবং ড. টিগার্ট। অন্যান্য ভারতীয় সদস্য হলেন ড. তারকচাঁদ, ড. জাকির হোসেন, ড. লক্ষণ স্বামী মুদালিয়র, ড. মেঘনাদ সাহা, ড. নির্মল কুমার সিদ্ধান্ত। এদের মধ্যে ড. নির্মল কুমার সিদ্ধান্ত ছিলেন সদস্য সম্পাদক।

রিপোর্টপেশ

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

কমিশনের সদস্যগণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়ের কর্মপদ্ধতি পরিদর্শন এবং দেশের শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা বলির বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে ৭৪৭ পৃষ্ঠার একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। ১৯৪৯ খ্রীঃ প্রতিবেদনটি সরকারের কাছে পেশ করা হয়। সরকার এই প্রতিবেদন Report of the university Education Commission (1948 - 49) নামে পরবর্তীকালে মুদ্রিত ভাবে প্রকাশ করেন।

টিপ্পনী

A. কমিশনের বিচার্য বিষয়সমূহ

ভারত সরকারের যে নির্দেশের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়, তাতে কমিশনের কর্মপরিধি সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। যদিও কমিশন তাঁদের প্রতিবেদনে ওই কর্মপরিধির বাইরের কিছু কিছু বিষয়েও সুপারিশ করেন, তবু সেগুলি অপ্রাসঙ্গিক ভাবা যায় না, কারণ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন হিসেবে শিক্ষার উন্নয়নের স্বার্থে যে গুলি অবহেলা করা যায় না, সেগুলিকে কমিশন প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। সেই কারণেই প্রতিবেদনটি স্বাধীন ভারতে শিক্ষাচিন্তা বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিলে পরিণত হয়েছে।

কমিশনের কর্মপরিধি বা বিচার্য বিষয় সমূহ যা সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলি হলো -

১. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ :

ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা এবং গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ।

২. বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তনসাধন :

বিশ্ববিদ্যালয় গুলির গঠনতন্ত্র, নিয়ন্ত্রন, কর্ম পদ্ধতি এবং সীমা এর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় গুলির সম্পর্ক নির্ধারণ।

৩. নীতি নির্ধারণ :

আর্থিক সংগতি বা অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ।

৪. শিক্ষার নাম বজায় রাখা :

বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার অধীন মহাবিদ্যালয় গুলির শিক্ষার উপযুক্ত মান বজায় রাখা।

৫. পাঠক্রম প্রণয়ন ও সময় নির্ধারণ :

কলাও মানবিক বিষয়, বিজ্ঞান বিষয় এবং পেশাগত ও কারিগরি শিক্ষার সমতা রক্ষার মাধ্যমে পাঠক্রম প্রণয়ন এবং পাঠক্রম সমাপ্তির সময় নির্ধারণ।

৬. প্রবেশের মান নির্ধারণ :

বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষাগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রবেশের মান নির্ধারণ।

৭. শিক্ষাদানের মাধ্যম সম্পর্কে নীতি নির্ধারন :

বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন মাধ্যমে পঠন পাঠনের ব্যবস্থা হবে, সেই সম্পর্কে

সুনির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণ।

৮. ভারতীয় বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা :

ভারতের ঐতিহ্য, ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, ভাষা, চারুকলা সম্পর্কে উন্নততর শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ।

৯. অধিক সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন :

আঞ্চলিক বা অন্য কোনো ভিত্তিতে অধিক সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

১০. উচ্চতর গবেষণার ব্যবস্থা :

বিশ্ববিদ্যালয়ে বা সমতুল্য কোনোপ্রতিষ্ঠানে বিভিন্নমুখী জ্ঞানের উচ্চতর গবেষণার ব্যবস্থা গ্রহণ।

B .কমিশনের কর্মপরিচালনার নীতি

স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশন (বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন) নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যে যে সব পন্থা অবলম্বন করেন, সেগুলি হল -

১. প্রশ্নপত্র রচনাও প্রেরণ :

কমিশন দায়িত্ব গ্রহণের পর তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ব্যাপক আকার প্রশ্নগুচ্ছ প্রস্তুত করেন। এরপর ওই প্রশ্নগুচ্ছ দেশের প্রতিটি রাজ্যে প্রেরণ করেন। প্রশ্নগুচ্ছ যাঁদের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা হয় তারা হলেন -

(ক) প্রতিটি রাজ্যে সরকারের বিধানমন্ডলীর সভ্য।

(খ) প্রতিটি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী

(গ) প্রতিটি রাজ্যের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

(ঘ) দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য

(ঙ) প্রতিটি রাজ্য সরকারের শিক্ষা অধিকর্তা।

(চ) দেশের প্রতিটি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ

(ছ) দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান।

২. সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগের সঙ্গে সংযোগসাধন

প্রশ্নগুচ্ছের উত্তর সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন বিভাগে পত্রালাপের পাশাপাশি

টিপ্পনী

দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাশিবিজ্ঞান বা সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগ এবং স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের সঙ্গে সংযোগসাধনের ব্যবস্থা করেন।

৩. মহাবিদ্যালয় ওবিশ্ববিদ্যালয় সমীক্ষা

পত্রের মাধ্যমে প্রশ্নগুচ্ছ পাঠিয়ে তথ্য সংগ্রহের পর কমিশনের সভ্যরা দেশের বিভিন্ন মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজির হয়ে সমীক্ষা চালানোর ব্যবস্থা করেন।

টিপ্পনী

৪. তথ্য বিশ্লেষন ও প্রতিবেদন পেশ

কমিশন পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে সংগৃহীত তথ্যগুলি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষনের মাধ্যমেএকটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন।

C. উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য

১. বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ

বিশ্ববিদ্যালয় গুলিকে সমাজের নানা ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দানের উপযুক্ত ব্যাক্তিদের গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে । দেশকে অগ্রগতির পথে পরিচালিত করতে হলে প্রয়োজন উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন রাজনীতিবিদ, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, কারিগর আবিস্কর্তা প্রভৃতি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়।

২. জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা

বিশ্ববিদ্যালয় গুলিকে শিক্ষারমান উন্নয়নে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত প্রতিটি শিক্ষার্থী জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির যোগ্য প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারে।

৩. জগৎ ও মানবজীবন সম্পর্কে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার শিক্ষা

বিশ্ববিদ্যালয় গুলিকেশিক্ষার্থীদের সামনে সমগ্র জগৎ এবং মানবজীবন সম্পর্কে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধনের শিক্ষা

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
102

উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধন করা।

৫. মানব সভ্যতা সম্পর্কে ধারণা গঠনের শিক্ষা

উচ্চশিক্ষার অপর একটি লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর মধ্যে মানব সভ্যতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা গড়ে তোলা।

৬. জাতীয় সংহতি ও আন্তর্জাতিকতা বোধের শিক্ষা

উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য হবে ছাত্র-শিক্ষক, মহাবিদ্যালয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐক্যবোধ সৃষ্টি করা।

৭. বিজ্ঞান, কারিগরিবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যার প্রসার ঘটানোর শিক্ষা

বিজ্ঞান, কারিগরিবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যার প্রসার ঘটানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় গুলিকে উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে । বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যার কল্যাণে মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন সর্ববে।

টিপ্পনী

D. গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারনা

সারা ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থা পর্যবেক্ষন করে কমিশন লক্ষ্য করেছিল । তখন দেশে যে সব মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সেগুলিতে মূলত শহরাঞ্চলের ছেলেমেয়েরাই উচ্চ শিক্ষার সুযোগ ভোগ করত । কিন্তু এই কমিশন উপলব্ধি করেছিল শহরাঞ্চলের ছেলেমেয়েদের মতো গ্রামাঞ্চলের ছেলে মেয়েদের অনুরূপ উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ দরকার । এই উদ্দেশ্যে রাধাকৃষ্ণন কমিশনের প্রতিবেদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষার সম্বন্ধে একটি সর্বাত্মক নতুন ধারণা যোগ করা । তৎকালীন ভারতের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক জীবনে গ্রামের গুরুত্ব উপলব্ধি করে কমিশনে শিক্ষা ব্যবস্থাকে গ্রামীন জীবনের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের কথাবলা হয়েছে।

১. পল্লী উন্নয়ন

কমিশন লক্ষ্য করেছিল ভারতের অধিকাংশ মানুষ গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে। তাদের সামগ্রিক উন্নতি করতে হলে, মুষ্টিমেয় বিত্তবান শহরাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের স্বার্থরক্ষা করলে চলবে না । বরং সবার আগে পল্লি উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দিয়ে গ্রামগুলিকে বিজ্ঞান সম্মতভাবে পুনগঠিত করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন গ্রামঞ্চলে উচ্চশিক্ষার বিস্তার।

২. কৃষি জনশিক্ষা ও সমাজ উন্নয়ন

সেখানে শহরাঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় গুলিতে সাধারণ বিষয় গুলির পাশাপাশি কারিগরি, যন্ত্রশিল্প, চিকিৎসাশাস্ত্র, আইন প্রভৃতি প্রাধান্য লাভ করে থাকে । সেখানে গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে প্রাধান্য লাভ করবে কৃষি,উদ্যানপালন, জনশিক্ষা, গ্রামোন্নয়ন, সমাজ উন্নয়ন প্রভৃতি।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
103

৩. শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা

প্রতিবেদনে এও বলা হয় কয়েকটি বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে

টিপ্পনী

একটি করে গ্রামীন মহাবিদ্যালয় এবং কয়েকটি গ্রামীন মহাবিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে একটি গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয়।

গ্রামীন শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন স্তর

গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারনায় একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রামীন শিক্ষা পরিকল্পনা উপস্থাপনা করে। এই শিক্ষা পরিকল্পনা চারটি স্তরের কথা বলা হয়। সেই গুলি হল -

স্তরের নাম	সময়কাল
নিম্ন ও উচ্চবুনিয়াদি শিক্ষা	৭ অথবা ৮ বছর
উত্তর বুনিয়াদি বা মাধ্যমিক শিক্ষা	৩ অথবা ৪ বছর
গ্রামীন মহাবিদ্যালয়ের স্নাতক শিক্ষা	৩ বছর
গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শিক্ষা	২ বছর

৪. মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও আদর্শ গ্রাম গঠন

কমিশনে প্রাথমিক স্তরের গ্রামীন শিক্ষা সম্পর্কে তেমন কোনো সুপারিশ করা হয়নি। কারন এই পর্যায়ের শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনার মাধ্যমে বাস্তবায়িত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। কমিশনে উত্তর বুনিয়াদি তথা মাধ্যমিক বিদ্যালয় গুলিকে অনবাসিত করার সুপারিশ করা হয় এবং প্রতিটি উত্তর বুনিয়াদি বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে যাতে একটি আদর্শ গ্রাম গড়ে তোলা যায় তার জন্য পরামর্শ দান করা হয়।

৫. তত্ত্বগতও ব্যাবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা

বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রামীণ শিল্প, অর্থনীতি, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে গবেষনা মূলক কাজের ও সুযোগ থাকবে। মহাবিদ্যালয় গুলির প্রতিটিতে ১৫০০ জনের বেশি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগ মিলিয়ে ৩০০ জনের বেশি শিক্ষার্থী থাকবে না। উচ্চশিক্ষার পাঠক্রমে প্রধান বিষয় হিসেবে যে গুলিতে পাঠদানের ব্যবস্থা থাকবে সে গুলি হল - ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, সমাজ বিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, অর্থনীতি, কৃষিবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা, শারীরবিদ্যা ইত্যাদি।

গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্তী অবস্থা

তাই গ্রামীন উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ভারত সরকারকে পরামর্শ দানের জন্য ১৯৫৬ খ্রিঃ 'National Council of Rural Higher Education' গঠন করা হয়। প্রায় চোদ্দ - পনেরটি Rural Institute গঠন করা হয়। আমাদের রাজ্যে বোলপুরের কাছে শ্রীনিকেতনে এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। NCRHE এর সুপারিশে গ্রামীন অর্থ নীতি, সমবায়, সমাজ বিজ্ঞান ও সমষ্টি উন্নয়ন বিষয়ে পঠন পাঠন ও ডিগ্রী

প্রদানের কথা বলা হলেও বাস্তবে মাত্র কয়েকটি বিষয়ে ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্স চালু হয়। কোর্সগুলির নাম ও সময়সীমা নীচে উল্লেখ করা হয় -

কোর্সের নাম	সময়সীমা / ব্যাপ্তি
গ্রামীন বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট কোর্স	২ বছর
গ্রামসেবা বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা কোর্স	৩ বছর
কৃষিবিজ্ঞানে সার্টিফিকেট কোর্স	২ বছর
সিভিল ও রুরাল ইঞ্জনিয়ারিং ও সার্টিফিকেট কোর্স	৩বছর
সেনেটারি ইন্সপেকটার এ সার্টিফিকেট কোর্স	১ বছর
ডিগ্রী কোর্স ভরতি হওয়ার জন্য ম্যাক্সিকুলেশন	
পাশ শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতি কোর্স	১ বছর

টিপ্পনী

E. বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার কাঠামো

ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় গুলির শিক্ষার মানোয়ন্নের জন্য শিক্ষার্থীদের অবশ্যই বিদ্যালয় এবং ইন্টারমিডিয়েট কলেজে বারো বছরের শিক্ষাক্রম শেষ করতে হবে। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতি জন্য আসতে হবে। বিদ্যালয় এবং ইন্টারমিডিয়েট স্তরে বারো বছর পাঠ শেষ করে সকল শিক্ষার্থী যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের জন্য না আসে তার জন্য দেশের বিভিন্ন অংশে যথেষ্ট সংখ্যক বৃত্তি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান খুলতে হবে। পাশ কোর্সে স্নাতক ডিগ্রীর জন্য দুবছর এবং অনার্স কোর্সে স্নাতক ডিগ্রীর জন্য শিক্ষার্থীদের ৩ বছর অধ্যায়ন করতে হবে। গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি, জনশিক্ষা, গ্রামোন্নয়ন, সমাজ উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামীণ শিক্ষাব্যবস্থার নিম্নস্তরে থাকবে বুনিয়াদি বিদ্যালয় এবং উচ্চস্তরে থাকবে গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয়। গ্রামীন শিক্ষা কাঠামোতে চারটি স্তর থাকবে। স্তরগুলি গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণাতে উল্লেখ করা হয়েছে।

F. শিক্ষক সমস্যা

যোগ্য প্রতিভাবান শিক্ষকের উপর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মান নির্ভর করে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার ও পুর্নবিন্যাস পরিপ্রেক্ষিতে যোগ্য সুশিক্ষক নিয়োগের প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সমসাময়িক কালে বিশ্ববিদ্যালয় এরূপ শিক্ষকের অভাব লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া গ্রন্থাগার, পাঠাগার, বীক্ষণাগারের অনুন্নত ব্যবস্থাপনার জন্য ইচ্ছা থাকলেও অনেকে গবেষণার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুযোগ পান না। যোগ্য শিক্ষকের অভাবে মেধাবী ছাত্রের প্রতিভার বিকাশ সম্ভব হচ্ছে না। তাই কমিশন শিক্ষা - সংশ্লিষ্ট

টিপ্পনী

বিষয় যেসব সুপারিশ করেন সেই গুলি হল -

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থাভাব দূর করতে হবে।

(খ) যোগ্যশিক্ষকের গুরুত্ব ও তাঁর দায়িত্বকে স্বীকৃতি দিতে হবে।

(গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককে মোট চারটি শ্রেনীতে ভাগ করতে হবে। যথা- অধ্যাপক, রিডার, লেকচারার ও ইনস্ট্রাক্টর।

(ঘ) প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকজন রিসাচ ফেলো থাকবেন।

(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বেতনহার হবে নিম্নরূপ -

অধ্যাপক - ৯০০ - ৫০ - ১৩৫০

রিডার - ৬০০ - ৩০ - ৯০০

লেকচারার - ৩০০ - ২৫ - ৬০০

ইনস্ট্রাক্টর - ২৫০

রিসার্চ ফেলো - ২৫০ - ২৫ - ৫০০

G. শিক্ষাদানের মান

উন্নতমানের শিক্ষাদান প্রসঙ্গে কমিশন যেসব সুপারিশ করেন সেইগুলি হল -

(ক) উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমের সঙ্গে ইন্টার মিডিয়েট শিক্ষাক্রম যুক্ত হবে। এখানে ১২ বছর শিক্ষা গ্রহণের পর শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার অর্জন করবে।

(খ) প্রত্যেক প্রদেশে অধিক সংখ্যক উন্নতমানের ইন্টারমিডিয়েট কলেজ স্থাপন করতে হবে।

(গ) ১০ বা ১২ বছরের শিক্ষা সমাপ্তির পর শিক্ষার্থীর অধিক সংখ্যায় যাতে বৃত্তি শিক্ষা লাভের সুযোগ পায় সেই জন্য অধিকাংশ বৃত্তি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে।

(ঘ) বিদ্যালয় এবং ইন্টারমিডিয়েট কলেজের শিক্ষকদের শিক্ষণগত যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় গুলিকে রিফ্রেসার কোর্সের ব্যবস্থা করতে হবে।

H. পাঠক্রম - কলা ও বিজ্ঞান

(ক) ১২ বছর বিদ্যালয় বা সমতুল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভের পর শিক্ষার্থীরা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বা বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হতে পারে।

(খ) পাস ও অনার্স উভয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্য ৩ বছর ডিগ্রী কোর্সে প্রবর্তন করা হবে। স্নাতকডিগ্রী নেওয়ার জন্য অনার্স কোর্সের শিক্ষার্থীরা ১ বছর ও পাস কোর্সের শিক্ষার্থীরা ২ বছর পড়াশুনার পর মাস্টার ডিগ্রী লাভ করবে।

(গ) শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষা ও বিশেষধর্মী শিক্ষার মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করতে হবে।

I.স্নাতকোত্তর শিক্ষণ ও গবেষনা : কলা ও বিজ্ঞান

টিপ্পনী

(ক) পি. এইচ. ডিগ্রীর শিক্ষণকাল হবে অন্ততঃ ২ বছর। এরূপ শিক্ষার্থীর জ্ঞানের গভীরতা ও প্রসারতা উভয় দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই ডিগ্রীর জন্য থিসিস ছাড়াও মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

(খ) শিক্ষণ ধর্মী বিশ্ববিদ্যালয় গুলিকে সাম্ভাব্য প্রতিটি শাখায় গবেষণামূলক শিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং অনুমোদন ধর্মী বিশ্ববিদ্যালয় গুলিও সম্ভব মতো স্নাতকোত্তর গবেষনা বিভাগ স্থাপন করে গবেষনা পরিচালনা করবে।

(গ) উচ্চমানের মৌলিক গবেষনা কর্মের ফলশ্রুতি - স্বরূপ প্রকাশিত বিষয়ের জন্য ডি. লিট এবং ডি. এস. সি ডিগ্রী প্রদান করা হবে।

(ঘ) এদেশে বিজ্ঞান চেতনার উদ্বুদ্ধ কর্মী এবং প্রতিভাবান বিজ্ঞান শিক্ষকের অভাব পুরণের জন্য বিজ্ঞান চর্চার দিকে অধিক মনোযোগী হতে হবে।

(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয়ে মৌলিক গবেষণাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

J. পেশাগত শিক্ষা

পেশাগত শিক্ষা প্রসঙ্গে কমিশন মোট ৬টি বিষয়ে আলোচনা করেছেন, যেমন - (১) কৃষি, (২) বাণিজ্য (৩) শিক্ষাতত্ত্ব (৪) ইঞ্জিনীয়ারিং ও প্রযুক্তি বিজ্ঞান (৫)আইন (৬) চিকিৎসাবিদ্যা।

(১) কৃষি সম্পর্কে সুপারিশ

(ক) নিম্নস্তর থেকে উচ্চ শিক্ষার স্তর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের যাতে কৃষি শিক্ষা দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

(খ) কৃষি শিক্ষার প্রচলিত প্রতিষ্ঠান গুলির উন্নয়ন এবং নতুন নতুন কৃষি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের সঙ্গে থাকবে নীতি নির্ধারক সংস্থা ও স্নাতকোত্তর কৃষি গবেষণার সুব্যবস্থা।

টিপ্পনী

২. বাণিজ্য সম্পর্কে সুপারিশ

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত অবস্থায় বাণিজ্যের ছাত্র যাতে ৩ - ৪ টি বিভিন্ন ধরনের ফার্মে হাতে কলমে কাজ শিখতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

(খ) স্নাতক হওয়ার পর কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থীকে কোন কোন বিষয়ে (যেমন - এ্যাকাউন্টেন্সি) বিশেষজ্ঞ হওয়ার সুযোগ দিতে হবে।

৩. শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে সুপারিশ

(ক) ব্যবহারিক শিক্ষণ দেওয়ার জন্য উপযুক্ত বিদ্যালয়ের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে।

(খ) বিদ্যালয় শিক্ষকতা করার প্রাথমিক অভিজ্ঞতা আছে এমন ব্যাক্তিদের ভিতর থেকে ট্রেনিং কলেজের শিক্ষক নির্বাচন করতে হবে।

(গ) অধ্যাপক এবং লেকচারদের মৌলিক কাজগুলি যাতে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে পরিকল্পিত হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

৪. ইঞ্জিনীয়ারিং ও প্রযুক্তিবিজ্ঞান সম্পর্কে সুপারিশ

(ক) সকল স্তরের ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের প্রথমবর্ষের পাঠ্য একরূপ হবে এবং তত্ত্বগত বিষয়ের পাশাপাশি ব্যবহারিক বিষয় শিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে।

(খ) সম্ভব হলে বর্তমানের স্নাতক স্তরের টেকনোলজিক্যাল প্রতিষ্ঠান গুলিকে স্নাতোত্তর স্তরে উন্নীত করতে হবে। উপরন্তু অনতিবিলম্বে উচ্চতর টেকনোলজিক্যাল প্রতিষ্ঠান স্থাপনের চেষ্টা করতে হবে।

(গ) ইঞ্জিনীয়ারিং ও টেকনোলজিক্যাল প্রতিষ্ঠান গুলির উন্নয়ন প্রসঙ্গে আর্থিক সাহায্যের দায়িত্ব মূলতঃ কেন্দ্রীয় সরকারকেই গ্রহণ করতে হবে।

৫. আইন শিক্ষা সম্পর্কে সুপারিশ

(ক) আইন কলেজগুলিকে সম্পূর্ণরূপে পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন।

(খ) আইনে ডিগ্রী কোর্সের শিক্ষার্থীকে বিশেষ কয়েটি ক্ষেত্র ভিন্ন একই সময় অন্য কোন ডিগ্রী কোর্সের শিক্ষার্থীকে পড়াশুনা করার অনুমতি দেওয়া হবে না।

(গ)আইনের বিভিন্ন শাখার শিক্ষার্থীরা যাতে গবেষণা করতে পারেন তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৬. চিকিৎসা বিদ্যা সম্পর্কে সুপারিশ

(ক) মেডিক্যাল কলেজ হবে হাসপাতাল সংলগ্ন।

(খ) প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য দশটি করে শয্যা থাকবে।

(গ) ট্রেনিং প্রসঙ্গে পাবলিক হেলথ, ইঞ্জিনীয়ারিং ও নার্সিং এর উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।

K. ধর্মীয় শিক্ষা

কমিশন সুপারিশ করেন -

(ক) কয়েক মিনিট নীরব প্রার্থনা দিয়ে শিক্ষা - প্রতিষ্ঠানের কাজ শুরু করা কর্তব্য।

(খ) কমিশন ডিগ্রী কোর্সের প্রথম বছর মহাপুরুষের জীবনী পাঠ। দ্বিতীয় বছর প্রত্যেক ধর্মগ্রন্থ থেকে বিশ্বজননী আবেদনগুলির সঙ্কলন পাঠ এবং তৃতীয় বছরে ধর্মীয় দর্শনের মূল সমস্যা গুলি আলোচনা করার সুপারিশ করেন।

L. শিক্ষার মাধ্যম

ভাষা সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা করে এবং জাতীয় ঐক্যের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে কমিশন যেসব সুপারিশ করে সেগুলি হলো -

(ক) বিভিন্ন উৎসব থেকে শব্দ সংগ্রহ করে যুক্তরাষ্ট্রীয় একটি ভাষার শব্দ ভান্ডারের উন্নতি বিধান অবশ্যই করতে হবে।

(খ) কারিগরী ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত যে সব ভাষা আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, সেই গুলিকে ভারতীয় পরিভাষায় গ্রহণ করতে হবে।

(গ) উচ্চতর মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার্থীকে মোট তিনটি ভাষা জানতে হবে। যথা - আঞ্চলিক ভাষা, রাষ্ট্র ভাষা এবং ইংরাজী।

(ঘ) রাষ্ট্রভাষার ক্ষেত্রে দেবনাগরীলিপি ব্যবহার করতে হবে। তবে এই লিপির অসুবিধা গুলি যতদূর সম্ভব দ্রুত অপসারণ করতে হবে।

(ঙ) যাতে আমরা বিশ্বের ক্রমবর্ধমান জ্ঞান ভান্ডারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারি তার জন্য মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ইংরাজী শেখানোর ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

M. পরীক্ষা ব্যবস্থা

(ক) প্রথম ডিগ্রী পরীক্ষা তিন বছর অন্তে পরীক্ষা গ্রহন না করা নির্দিষ্ট সময় অন্তর কয়েকটি পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। ডিগ্রী প্রদানের পূর্বে এসব পরীক্ষার ফলাফল বিচার করা হবে।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

(খ) ১ম, ২য়, ৩য় বিভাগে সর্বনিম্ন পাশ নম্বর হবে যথাক্রমে ৭০, ৫৫, ৪০।

(গ) পরীক্ষক নির্বাচনের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কোন বিষয়ে অন্ততৎ পাঁচ বছর পড়ানোর অভিজ্ঞতা না থাকলে তাঁকে পরীক্ষক নিয়োগ করা চলেবে না। ডিগ্রী পরীক্ষায় বহিঃ পরীক্ষক একাধিক ক্রমে তিন বছরের বেশী সময় পরীক্ষক হিসেবে থাকতে পারবেন না।

(ঘ) উচ্চ শিক্ষার পরীক্ষাগুলিতে অনুগ্রহ নম্বর দেবার রীতি বর্জন করতে হবে।

(ঙ) স্নাতকোত্তর স্তর এবং পেশাতে ডিগ্রী পরীক্ষায় মৌলিক পরীক্ষা গ্রহণের রীতি প্রবর্তন করতে হবে।

N. ছাত্রদের কার্যাবলী ও ছাত্রমঙ্গল

(ক) প্রথমত : ছাত্র নির্বাচনে মেধা ভিন্ন অন্য কিছুর উপর নির্ভর করা চলবে না।

দ্বিতীয়ত : প্রথম ডিগ্রী কোর্সের বিভিন্ন বিষয় পঠন পাঠনের ব্যবস্থা থাকবে এবং ছাত্ররা পচ্ছন্দ অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন করবে।

তৃতীয়ত : স্নাতকোত্তর, পেশাগত ও গবেষনা স্তরের মধ্যে সমন্বয় বিধান করে শিক্ষাদান করতে হবে।

(খ) পরীক্ষার ভিত্তিতে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) ভর্তির সময় বিশেষ করে নির্দিষ্ট সময় অন্তর শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং রোগধরা পড়লে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের শারীর শিক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত শিক্ষক - শিক্ষাকর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকা ও বাঞ্ছনীয়।

(ঘ) কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনাধীন প্রতিটি কলেজে ন্যাশন্যাল ক্যাডেট কোর (N.C.C) এর শাখা থাকার প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকারকে এর সাজ সরঞ্জাম ও অর্থ সরবরাহ করতে হবে।

(ঙ) স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে ছাত্রদের সমাজ সেবায় উৎসাহিত করতে হবে।

(চ) স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ব্যবহারোপযোগী আসবাব পত্র ও সাজ-সরঞ্জামসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন ছাত্রাবাস স্থাপন করতে হবে।

(ছ) দলগত রাজনীতি থেকে মুক্ত এবং শৃঙ্খলা বিধানের অনুকূল ও ছাত্র

কল্যাণের পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র সংসদ গঠন করতে হবে।

(জ) বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রমঙ্গলের জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটিও গঠন করা নিতান্ত প্রয়োজন।

O. স্ত্রী-শীক্ষা

টিপ্পনী

(ক) স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে কমিশনের প্রথম বক্তব্য হল মেয়েরা শিক্ষা ক্ষেত্রে সম-সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে।

(খ) কো-এডুকেশনাল কলেজে মেয়েদের জন্য যেমন প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে তেমনি ছেলেরা যাতে সেখানে সৌজন্যবোধ এবং সামাজিক দায়িত্ব ও সম্পর্কে সচেতন হয় তার ব্যবস্থাও করতে হবে।

(গ) মহিলা নাগরিক হিসাবে মেয়েদের পৃথক দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। এর জন্য তাদের বিশেষ ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। তারা যাতে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, গৃহ প্রশাসন, গার্হস্থ্য অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষালাভ করতে পারে তার ব্যবস্থা ও থাকবে।

P. শাসনতন্ত্র ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

(ক) বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা বে সংবিধানের যুগ্ম তালিকাভুক্ত।

(খ) অর্থ বরাদ্দ, সুযোগ-সুবিধা ও সমন্বয়, জাতীয় নীতিনির্ধারন, প্রশাসন ব্যবস্থার দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় গবেষণাকেন্দ্র গুলির মধ্যে যোগাযোগ ইত্যাদি ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সম্পর্ক থাকবে।

(গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ বরাদ্দের ব্যাপারে সেন্ট্রাল গ্রান্টস কমিশন স্থাপন করতে হবে। এই গ্রাল্টস কমিশনকে সাহায্য করবে বিভিন্ন শাখার অন্তর্ভুক্ত বিশেষজ্ঞ ব্যাক্তিবর্গ।

(ঘ) নিছক অনুমোদনধর্মী কোন বিশ্ববিদ্যালয় থাকবে না।

(ঙ) সরকারী কলেজ-গুলি ক্রমশঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত কলেজে রূপান্তরিত হবে।

(চ) প্রাইভেট কলেজগুলিকে অনুমোদন দেওয়ায় সময় লক্ষ্য রাখতেহবে -

(১) তাদের গ্রান্ট-ইন-এইড পাওয়ার যোগ্যতা এবং (২) তাদের শিক্ষার্থীদের আভ্যন্তরীন কর্মের মূল্যায়ন করার সামর্থ্য আছে কিনা।

(ছ) কলেজ পরিচালক সমিতিকে যথাযথ উপায়ে সংগঠন করতে হবে।

টিপ্পনী

(জ) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সংগঠনে থাকবেন (১) ভিজিটর (২) চ্যান্সেলার (৩) ভাইস চ্যান্সেলার (৪) সেনেট (৫) একজিকিউটিভ কাউন্সিল (৬) একাডেমিক কাউন্সিল (৭) ফ্যাকাল্টিজ (৮) বোর্ডস অব স্টাডিজ (৯) ফিন্যান্স কমিটি এবং (১০) সিলেকশন কমিটি সমূহ।

(ঝ) বিশ্ববিদ্যালয় সহ রাজ্যগুলির জন্য একটি গ্রান্টস এ্যালোকেশন কমিটি গঠন করতে হবে।

Q. অর্থসংস্থা

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে অর্থ সংস্থানের জন্য কমিশন সুপারিশ করেন যে, সরকারকেই উচ্চ-শিক্ষার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতেহবে। প্রাইভেট কলেজ গুলির বিল্ডিং সাজ - সরঞ্জাম ক্রয় ও পৌনঃপুনিক ব্যায় বাবদ অর্থ সাহায্য করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে অতিরিক্ত বার্ষিক দশ কোটি টাকার বরাদ্দ মঞ্জুর করতে হবে। শিক্ষার উন্নয়নে অর্থদাতাকে আয়কর থেকে অব্যাহতি দিতে হবে। এছাড়া অর্থ বরাদ্দের সুবিধার জন্য পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন গঠন করতে হবে।

নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গঠন ও অন্যান্য সংস্কার

(১) রাধাকৃষ্ণন কমিশন বারাণসী ও আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিধা ও অসুবিধা বিচার করে এদের সাম্প্রদায়িক সনদ বাতিল করার সুপারিশ করে।

(২) কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় যাতে শিক্ষার্থীরা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে পঠনপাঠনের সুযোগ পায়। তার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রণের স্বপক্ষে কমিশন অভিমত ব্যক্ত করে।

(৩) নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি প্রাধান্য দিতে হবে।

সমালোচনা

(১) কমিশন অতি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষনা করেছে দেশের উচ্চশিক্ষার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান হল বিশ্ববিদ্যালয়। তাই বিশ্ববিদ্যালয় গুলিকে এগিয়ে আসতে হবে নতুন ভারত গঠনের মৌলিক দায়িত্ব গ্রহনের উদ্দেশ্য।

(২) দেশের জন্য প্রয়োজনীয় দায়িত্বশীল নেতৃত্ব সরবরাহ করবে বিশ্ববিদ্যালয় গুলি।

(৩) কমিশন ভারতের প্রচলিত শিক্ষার বিভিন্ন ত্রুটি তুলে ধরেছে। যেমন নিম্নমুখী শিক্ষার মান, প্রশাসনিক ব্যর্থতা ইত্যাদি।

(৪) অর্থ বন্টনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন গঠন এবং গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়ক সুপারিশ দুটি নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয় এবং প্রশংসনীয়।

অনুশীলনী

১। উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে বিশেষ করে গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণন কমিশনের সুপারিশগুলি পর্যালোচনা কর।

২। ভারতে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণন কমিশনের সুপারিশ গুলি পর্যালোচনা কর।

৩। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণন কমিশনের বক্তব্য নিয়ে আলোচনা কর।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

মুদালিয়র কমিশন

এই অধ্যায়ের শেষে শিক্ষার্থীরা -

(১) মুদালিয়র কমিশন (১৯৫২ -৫৩) এর প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে সক্ষম হবে

(২) মুদালিয়র কমিশন এর মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।

(৩) মুদালিয়র কমিশনের পাঠ্যক্রম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে।

টিপ্পনী

ভূমিকা

১৯৫২ খ্রীঃ ২৩ শে সেপ্টেম্বর মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ লক্ষ্মনস্বামী মুদালিয়রের নেতৃত্বে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন নামে একটি কমিশন গঠন করা হয়। মুদালিয়র এর নামানুসারে এই কমিশনকে মুদলিয়ার কমিশন নামে অভিহিত করাহয়।

কমিশনের সদস্য

মুদালিয়র কমিশনের মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৯। বিদেশীদের মধ্যে হলেন জন ক্রিস্টি এবং ডঃ কিনেথ রাস্ট্ উইলিয়াম। ভারতীয়দের মধ্যে হলেন লক্ষ্মনস্বামী মুদালিয়র, কে. এস. শ্রীমালী, শ্রীমতী হংস মেহতা, শ্রী জে. এ. তারা ভেলা, শ্রী এস. টি ব্যাস, শ্রী কে. জি. সায়েদিন এবং শ্রী অনাথ বসু।

রিপোর্ট পেশ

১৯৫৩ খ্রীঃ কমিশন ভারত সরকারের কাছে ৩১১ পৃষ্ঠা সংকলিত দীর্ঘ রিপোর্ট পেশ করে। রিপোর্টটিতে ১৬টি অধ্যায়ে মাধ্যমিক শিক্ষায় বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

A. কমিশনের বিচার্য বিষয়সমূহ

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
115

সরকার যেসব বিষয়ে কমিশনের কাছ থেকে সুপারিশ আহ্বান করেছিল সেগুলি হল -

(১) লক্ষ্য নির্ধারণ :

মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার লক্ষ্য কি হবে তা নির্ধারণ।

টিপ্পনী

(২) লক্ষ্যে পৌছানোর পাঠ সম্পর্কে নির্দেশনা :

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য উপযুক্ত পথ সম্পর্কে নির্দেশনা দান।

(৩) শিক্ষার পুর্ণগঠন সম্পর্কে পরামর্শ :

তৎকালীন সময়ে প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষার পুর্নগঠন কি ভাবে করা যায়, সে সম্পর্কে সুচিন্তিত মতামত দান।

(৪) পাঠক্রম প্রণয়নে পরামর্শ :

মাধ্যমিক শিক্ষা পাঠক্রমে কী জাতীয় পরিবর্তণ প্রয়োজন এবং তা কীভাবে প্রনয়ন করা হবে সে সম্পর্কে পরামর্শ দান।

(৫) বিদ্যালয়ের পুনর্বিন্যাস :

তৎকালীন মাধ্যমিক বিদ্যালয় গুলির পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে পরামর্শদান।

B. প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি

শিক্ষার সংস্কার ও পুর্ণগঠনের সুবিধার জন্য কমিশন কতগুলি ত্রুটি সুসংবদ্ধভাবে প্রকাশ করে। সেগুলি হল -

(১) বাস্তবজীবনের সঙ্গে সংগতিহীন পাঠক্রম :

সারা দেশের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে যে শিক্ষাদান করা হয় তার সঙ্গে সঠিক অর্থে জীবনের কোন সংযোগ নেই।

(২) বৈচিত্র্যহীন শিক্ষা :

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠক্রম বৈচিত্র্যহীন ও গতানুগতিক শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ ঘটে না।

(৩) পুথিগত বিদ্যার উপরে গুরুত্ব :

প্রচলিত শিক্ষায় বিদ্যালয় গুলিতে কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যার আয়ত্বের উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

(৪) মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা :

তৎকালীন মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কেবল ইংরেজি শিক্ষার বিষয়ে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হত।

(৫) শিক্ষকদের আর্থিক দুরাবস্থা :

বেশিরভাগ বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকরা উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও সুযোগ সুবিধা পেতেন না। এর ফলে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বিপর্যয় দেখা যায়।

C. মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কিত সুপারিশ সমূহ

কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষায় কয়েকটি লক্ষ্য স্থির করেন। সেগুলি হল -

টিপ্পনী

(১) উপযুক্ত নাগরিক সৃষ্টি:

কমিশনের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীদেরকে জাতীয় লক্ষ্যপূরণের সহায়ক সুযোগ্য নাগরিক রূপে গড়ে তোলা । এমন একপ্রকার শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ভাবীকালে দেশের সুযোগ্য নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সমর্থ হবে।

(২) জাতীয় সম্পদ বদ্ধি :

শিক্ষার্থীদের এমন ভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে যার ফলে তারা আগামী দিনে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধিতে এবং জীবনের মান উন্নয়নে গুরুদায়িত্ব পালণে আগ্রহী ও সমর্থ হয়।

(৩)গনসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ঘটানো:

জীবনের অধিকাংশ সময়ই ব্যায় করতে হয়েছে কেবলমাত্র দুবেলার অন্নসংস্থানের জন্য। ফলে গণসংস্কৃতির বিকল্প পদে বাধাগ্রস্থ হয়েছে। অথচ দেশের সমৃদ্ধির জন্য গণসংস্কৃতির বিকাশ অপরিহার্য।

(৪) গণতান্ত্রিক মনোভাব গড়ে তোলা :

স্বাধীন ভারতের বিকাশোন্মুখ সমাজ ব্যবস্থায় ছাত্রছাত্রীরা যাতে আগামী দিনে যোগ্য, সক্ষম সুনাগরিক হয়ে উঠতে পারে তার জন্য চরিত্র গঠনে সহায়ক শিক্ষা কাঠামোর ব্যবস্থা করতে হবে।

(৫) আর্থনৈতিক বিকাশে সহায়তা:

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
117

একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক ও বৃত্তিমূলক দক্ষতার উন্নতি সফল করা।

(৬) সাংস্কৃতিক বিকাশে সহায়তা :

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সাহিত্য, শিল্প, সাংস্কৃতিক আগ্রহ ও প্রবণতার বিকাশ ঘটানো।

টিপ্পনী

(৭) নেতৃত্বদানের যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা :

মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো হওয়া উচিত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যোগ্যতা তৈরি করা নৈতৃত্বদানের । এই উদ্দেশ্যে কমিশন সুপারিশ করে, ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত দেশের প্রতিটি শিক্ষার্থীর স্বয়ংসম্পূর্ন ও পূর্ণাঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষার প্রয়োজন।

(৮) মানবিক গুণাবলির বিকাশ :

মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য হবে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করা , কর্ম প্রেরণা জাগ্রত করা এবং বিভিন্ন মানবিক গুনাবলির বিকাশ গঠনে সহায়তা করা।

D. মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো সংক্রান্ত সুপারিশ সমূহ:

সাধারণ শিক্ষার কাঠামো সংক্রান্ত সুপারিশ :

(১) শিক্ষার সময়কাল :

বিদ্যালয় শিক্ষার সময়কালকে ১২ বছর করার পক্ষে মত ব্যক্ত করেছে।

(২) প্রাথমিক শিক্ষাস্তর :

কমিশনের সুপারিশ হল ৪ বা ৫ বছরের প্রাথমিক স্তরের পর মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর শুরু হবে।

(৩) মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর :

মাধ্যমিক শিক্ষার দুটি পর্যায় -(ক)নিম্ন মাধ্যমিক স্তর - ৩ বছরের উচ্চ বুনিয়াদি বা ৪ বছরের নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর। (খ) উচ্চতর মাধ্যমিক স্তর - ৪ বছরের উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাস্তর।

(৪) বিকল্প শিক্ষা কাঠামো :

নতুন প্রস্তাবে বলা হয়, প্রচলিত ব্যবস্থা অনুযায়ী ১০ বছরের বিদ্যালয় শিক্ষা হবে ৯.১ বছরের। শিক্ষায় যে ইন্টারমিডিয়েট স্তরটি ছিল, সেটিকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করে তার ১ বছর মাধ্যমিক স্তরের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে ও বাকি এক বছরকে স্নাতক স্তরের সঙ্গে যোগ করে ৩ বছরের ডিগ্রী কোর্স পড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

কারিগরি শিক্ষার কাঠামো সম্পর্কিত সুপারিশ :

(১) কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন :

প্রতিটি রাজ্যে পৃথকভাবে বা বহুমুখী বিদ্যালয়ের সঙ্গে অধিক সংখ্যক

কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন করা দরকার।

(২)কেন্দ্রীয় কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন :

দেশের বড়ো বড়ো শহরগুলিতে কেন্দ্রীয় কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন করা দরকার।

(৩) AICTE সহযোগিতা গ্রহণের ব্যবস্থা:

পাঠ্যক্রম প্রনয়ন, নিয়মনীতি নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণের জন্য AICTE মতো সংস্থা গুলির পরামর্শ নেওয়া।

টিপ্পনী

অন্যান্য বিদ্যালয়ের কাঠামো সম্পর্কিত সুপারিশ :

(১) আবাসিক বিদ্যালয়ের কাঠামো সম্পর্কিত সুপারিশ :

যে সব ব্যাক্তি বদলিযোগ্য চাকুরি করেন তাদের সন্তানদের জন্য গ্রামাঞ্চলে আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন।

(২) বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপন :

দৈহিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ধরনের বিদ্যালয় স্থাপন।

সমশিক্ষার কাঠামো সম্পর্কিত সুপারিশ :

(১) বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা :

সহশিক্ষার বিদ্যালয়ে এবং কেবলমাত্র মেয়েদের জন্য স্থাপিত বিদ্যালয়ে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) সরকারী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা :

সরকারী প্রচেষ্টায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে।

E. পাঠক্রমে সাতটি মূল প্রবাহের অবতারণা

পাঠক্রমের আবশ্যিক বা মূল অংশের বিষয়সমূহ -

(১) ভাষা :

এই পর্যায়ে দুটি ভাষা শেখা দরকার।

(ক) মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা।

(খ) নীচে উল্লিখিত ভাষাগুলির মধ্যে যে কোন একটি -

টিপ্পনী

(অ) হিন্দি - যাদের মাতৃভাষা নয়।

(আ) প্রাথমিক ইংরেজি - যারা আগে ইংরেজি পড়েনি।

(ই) ইংরেজি - যারা আগে ইংরেজি পড়েছে।

(ঈ) একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা (হিন্দি বাদে)

(উ) একটি আধুনিক ইউরোপীয় ভাষা (ইংরেজি বাদে)

(২) সমাজবিজ্ঞান :

সাধারণ পাঠ (প্রথম দুবছরের জন্য)

(৩) গণিত ও সাধারণ বিজ্ঞান :

সাধারণ পাঠ (প্রথম দুবছরের জন)

(৪)হাতের কাজ:

নিম্নলিখিত বিষয় গুলির মধ্যে যে কোন একটি -কাঠের কাজ, ধাতুর কাজ, বয়ন ও বুনন কাজ,বাগান তৈরি, সেলাই ও সুচি শিল্প, মূর্তি নির্মান ইত্যাদি।

পাঠক্রমের ঐচ্ছিক বিষয়ের ভাগ:

কমিশন ঐচ্ছিক পাঠক্রমকে বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়গুলিকে ৭টি বিভাগে ভাগ করে উপস্থাপন করেছেন।

(ক) মানবিক বিদ্যা

(খ) বিজ্ঞান

(গ) কারিগরি বিদ্যা

(ঘ) বাণিজ্য

(ঙ) কৃষিবিদ্যা

(চ) চারুকলা

(ছ)গার্হস্থ্য বিজ্ঞান

অতিরিক্তবিষয়:

শিক্ষার্থীরা উপরোক্ত বিষয়গুলি থেকে আরও একটি বিষয়কে অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে গ্রহণ করতে পারবে।

F. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্নরূপ ও সর্বার্থসাধক উচ্চবিদ্যালয় :

নীচে কয়েক প্রকার বিদ্যালয় সম্পর্কে আলোচনা করা হল -

(১) নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় :

কমিশনের মতে এই বিদ্যালয়ে তিনটি শ্রেণি থাকবে। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ছাত্র-ছাত্রীরা এই বিদ্যালয়ে ভরতি হতে পারবে।

টিপ্পনী

(২) উচ্চবিদ্যালয় :

তৎকালীন সময়ে প্রচলিত দশম শ্রেণির বিদ্যালয় গুলি এই বিভাগের অন্তর্গত ।

(৩) উচ্চতর বিদ্যালয় :

এই ধরনের বিদ্যালয় অষ্টম শ্রেণি থেকে একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদানের ব্যবস্থা থাকবে।

(৪) কৃষিশিক্ষার বিদ্যালয়:

কৃষি বিষয়ে শিক্ষারজন্য কৃষি বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে । এছাড়াও বাগান তৈরি, পশুপালন ও কুঠির শিল্প বিষয়ে পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে ।

(৫)কারিগরি শিক্ষারবিদ্যালয় :

দেশের শিল্প গুলির নিকটবর্তী অংশে কারিগরি শিক্ষার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৬)পাবলিক বিদ্যালয় :

পাবলিক স্কুলগুলিকে জাতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণীত হয়ে পঠনপাঠন চালানোর জন্য সুপারিশ করেন।

(৭)আবাসিক বিদ্যালয়:

যে সমস্ত ব্যাক্তিকে চাকুরী সূত্রে বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে হয় তাদের ছেলে মেয়েদের জন্য গ্রামাঞ্চলে কমিশন আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করে।

টিপ্পনী

G. পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কিত সুপারিশ সমূহ

(১) পাঠ্যপুস্তক কমিটি গঠন :

পাঠ্যপুস্তকের গুনমাণ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন একটি পাঠ্যপুস্তক কমিটি গঠনের সুপারিশ করেন। এই কমিটিতে যারা সভ্য হিসাবে যোগদান করতে পারবেন তাঁরা হলেন -

(ক) রাজ্য সরকারের বিচার বিভাগীয় প্রতিনিধি।

(খ) PSC এর একজন সদস্য।

(গ) আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।

(ঘ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দুইজন প্রধান শিক্ষক।

(ঙ) দুইজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ।

(চ) সরকারি শিক্ষা আধিকারিক।

(২) তহবিল গঠন ও আর্থিক সাহায্য দান :

এই তহবিল থেকে মেধাবি শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য বিনা মূল্যে পুস্তক বিতরন এবং অন্যান্য আর্থিক সাহায্য দান।

(৩) পুস্তক নির্বাচন :

বিদ্যালয়ে কোন শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোন বিষয়ে একটি মাত্র পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করা যাবে না।

(৪) পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তনের নীতি :

কমিশন বিদ্যালয় স্তরের কোন শ্রেণিতে বছর বছর বই পরিবর্তনের পক্ষপাতী নয়।

H. শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কিত সুপারিশ সমূহ

(১) মুখস্থের পরিবর্তে কর্মমুখী প্রকল্প পদ্ধতি প্রবর্তণ :

পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে মুখস্থের পরিবর্তে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন কর্মমুখী প্রকল্পে যুক্ত করার সুপারিশ করা হয়।

(২) বাড়ির কাজের উপর গুরুত্ব আরোপ :

কমিশন ছাত্রছাত্রীদের দৈনন্দিন বাড়ির কাজ দেওয়ার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত

করেন।

(৩) গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা :

প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যাতে গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে তার জন্য কমিশন সুপারিশ করে। ছাত্রছাত্রীরা যাতে নিয়মিত গ্রন্থাগারে গিয়ে পড়াশোনা করে সে বিষয়টি লক্ষ্য রাখার জন্য শিক্ষক শিক্ষিকা ও গ্রন্থাগারিককে সচেষ্ট হওয়ার পরামর্শ দান করা হয়।

টিপ্পনী

I. পরীক্ষার সংস্কার সম্পর্কিত সুপারিশ সমূহ

মুদালিয়র কমিশন মাধ্যমিক পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার প্রসঙ্গে কতকগুলি মূল্যবান সুপারিশ করেন। সেগুলি হল -

(১) গতানুগতিক পরীক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক বিষয়াত্মক পরীক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা নির্ভরযোগ্য করে তোলার ব্যাপারে মত প্রকাশ করেন।

(২) বিদ্যালয় জীবনের সব ধরণের ঘটনাবলি সর্বাত্মক পরিচয় পত্র বা CRC এ লিপিবদ্ধ করার সুপারিশ করেন।

(৩)মাধ্যমিক স্তরের শেষে কেবলমাত্র একটি সাধারণ বহিস্থ পরীক্ষা গ্রহণের সুপারিশ করেন।

(৫) সাধারণ বহিস্থ পরীক্ষায় একটি বা দুটি বিষয়ে যারা অকৃতকার্য হবে তাদের মধ্যে কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা প্রচলনের সুপারিশ করে।

J. বিদ্যালয় পরিচালনা সম্পর্কিত সুপারিশ সমূহ

(১) কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষার্থী সংখ্যা ৭৫০ এর বেশি হবে না।

(২) প্রত্যেক শ্রেণির শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪০ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতেহবে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা এর বেশি হলে বিদ্যালয় পরিচালনার দিক থেকে অসুবিধার সৃষ্টি হবে।

K. শিক্ষক সম্পর্কিত সুপারিশ সমূহ

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
123

(১) শিক্ষক নির্বাচনও নিয়োগের নীতি :

বিদ্যালয়ে শিক্ষক নির্বাচন ও নিয়োগের ব্যাপারে যথাসম্ভব একই নীতি অনুসরণ করতে হবে।

(২) যোগ্যতা অনুযায়ী বেতন দানে কমিটি :

শিক্ষকদের যোগ্যতা অনুযায়ী যাতেবেতন প্রদান করা যায় তার জন্যবিশেষ

কমিটি নিয়োগ করতে হবে।

(৩) অবসরের বয়স :

শিক্ষকদের অবসরের বয়স হবে ৬০ বছর।

(৪) বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ :

শিক্ষকের ছেলে মেয়েরা বিনা বেতনে বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়।

টিপ্পনী

(৫) গৃহশিক্ষকতা বারন :

বিদ্যালয়ে নিযুক্ত কোন শিক্ষকই গৃহশিক্ষকতা করতে পারবেন না।

(৬) আর্থিক নিরাপত্তা :

শিক্ষকদে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও জীবন বীমার ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে।

(৭) শিক্ষক প্রশিক্ষন :

প্রশিক্ষন বিহীন শিক্ষকদের জন্য সরকার স্নাতকদের জন্য এক বছরের এবং যাদের স্নাতক নয় তাদের জন্য দুই বছরের শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

L. সমালোচনা

তত্ত্ব ও আদর্শের দিক থেকে কমিশনের সুপারিশ গুলি আকর্ষনীয় হলেও প্রয়োগের দিক থেকেএর ত্রুটির পরিমাণ ও নিতান্ত কম নয়। এগুলি হল -

(১) কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্দেশ করেছে। কিন্তু কীভাবে সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব তার পথ নির্দেশ করেননি।

(২) কমিশন বহুমুখী পাঠক্রম প্রবর্তনের সুপারিশ করেছিল। এর জন্য প্রয়োজন ছিল বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপন। বাস্তব ক্ষেত্রে সমস্ত দশমশ্রেণির বিদ্যালয়কে পরিকাঠামোর অভাবে বহুমুখী বিদ্যালয়ে পরিবর্তিত করা সম্ভব হয়নি।

(৩) কমিশন ব্যাক্তি বৈষম্যের নিঈ অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, প্রবণতা এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে বিষয় নির্বাচনের সুপারিশকরেছিল। বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যাক্তি বৈষম্য অনুসারে পরামর্শ ও পরিচালনার ব্যবস্থা অবলম্বন অধিকাংশ বিদ্যালয়েই সম্ভব হয় নি।

(৪) কমিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নির্দেশনা ও পরামর্শদানের সুপারিশ করেছিল। বাস্তবে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে সঠিক নির্দেশনা ও পরামর্শের জন্য অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাব রয়েছে।

(৫) কমিশন পরীক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করার কথা বলেছে । এই সংস্কারের সঠিক নির্দেশ না থাকায় মাধ্যমিক স্তরের মূল্যায়ন আজও পরীক্ষা শাসনে জর্জরিত।

ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলেও মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশ গুলির ফলশ্রুতি হিসেবে মাধ্যমিক স্তরে বেশ কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে । এই পরির্তনের মধ্য দিয়েই আগামী দিনে আমাদের দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা জাতীয় আশা আকাঙ্খা পূরণের সহায়ক হবে উঠবে।

টিপ্পনী

অনুশীলনী

১। মুদালিয়র কমিশন (১৯৫২ - ৫৩) প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন সম্পর্কে বিশ্লেষণ মুলক আলোচনা কর।

২ । মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে কাঠামো ও পাঠ্যক্রম বিষয়ে মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশগুলি আলোচনা কর।

৩। মুদালিয়র কমিশনের পাঠ্যক্রম ও কারিগরী শিক্ষার সুপারিশ গুলি আলোচনা কর।

টিপ্পনী

কোঠারী কমিশন

টিপ্পনী

এই অধ্যায়ের শেষে শিক্ষার্থীরা-

(১) কোঠারী কমিশনের বর্ণনা দিতে সক্ষম হবে।

(২) প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।

(৩) কোঠারী কমিশনে উল্লেখিত বৃত্তিমুখী ও কারিগরী শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে।

(৪) কোঠারী কমিশনের সুপারিশ গুলি বলতে সক্ষম হবে।

ভুমিকা

১৯৬৪ সালের ১৪ ই জুলাই তৎকালীন সরকার ড. ভি. এস কোঠারীর নেতৃত্বে ১৭ জন সদস্যের একটি কমিশন নিয়োগ করে। কমিশন ১৯৬৪ সালে ২রা অক্টোবর থেকে কাজ শুরু করে। কমিশন প্রায় ৯০০০ প্রতিষ্ঠিত ব্যাক্তি, শিক্ষাবিদ, বৈজ্ঞানিক, শিল্পসংস্থার কর্ণধার এবং বিভিন্ন বিষয় পন্ডিত ব্যাক্তিগণের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। ১৯৬৬ সালের ২৯জুন রিপোর্ট জমা দেয়। রিপোর্টটি "Educational and National Development' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টে প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ স্তর ও শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে।

A. শিক্ষা কমিশনে উল্লেখিত দেশের সমস্যা সমূহ

কমিশন দেশের বিভিন্ন সমস্যাগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এগুলি হল -

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
127

(১) খাদ্য সমস্যা :

আমরা যাতে খাদ্য সংগ্রহে স্বনির্ভরতা লাভ করতে পারি সেই দিকে নজর রেখে শিক্ষাকে প্রয়োগ করা উচিত।

(২) অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা বেকার সমস্যা :

অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য G.N.P(জাতীয় আয়) প্রতিবছর ২ শতাংশ করে

বাড়ানো উচিত এবং এই জাতীয় আয়ের সমবন্টনের দিকে নজর রাখা উচিত। এর সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

(৩) সামাজিকতা ও জাতীয় সংহতি সমস্যা :

আঞ্চলিকতা বোধ, বর্ণবৈষম্য, সাম্প্রদায়িকতা, শ্রেণিভেদ, ভাষাভেদ প্রভৃতির ফলে দেশের জাতীয় সংহতি বিপন্ন হয়। তাই জাতীয় ও সামাজিক সংহতি সাধনের জন্য চাই উপযুক্ত শিক্ষা।

টিপ্পনী

B. জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ সমূহ

শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের শুরুতেই বলেছে ভারতের ভাগ্য নির্ধারিত হয় তার শ্রেণিকক্ষে উক্তিটি সর্বাংশে সত্য।

(১) শিক্ষার পুনর্গঠন :

এই অবস্থা পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় উন্নয়নের সার্বিক প্রচেষ্টা অনেকাংশে নির্ভর করছে শিক্ষার নতুন ভূমিকার উপর। এর জন্য প্রয়োজন হল বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার মূল্যায়ন। তাই মূল্যায়নের মাধ্যমেই জানা যাবে শিক্ষার নতুন ভূমিকার রূপ।

(২) শিক্ষা সংস্কার :

কমিশন মনে করে শিক্ষা সংস্কারের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো জনগণের জীবন, চাহিদা এবং উচ্চাকাঙ্খার সঙ্গে শিক্ষাকে যুক্ত করা। এর ফলে জাতীয় লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন গুলি কার্যকর করা সম্ভব হবে।

(৩) শিক্ষার উৎপাদনশীলতা :

(ক) বিজ্ঞান শিক্ষা : বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে মুক্তমন অপরকে সহ্য করার ক্ষমতা, কু-সংস্কার মুক্ততা ইত্যাদি গড়ে উঠতে পারে

(খ) কর্ম অভিজ্ঞতা : সমস্ত স্তরের শিক্ষার ক্ষেত্রে কর্ম অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং সাধারণ শিক্ষার অপরিহার্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে।

(৪) শিক্ষার বৃত্তিমুখীকরণ

(ক) বৃত্তিশিক্ষার প্রসার :

১৯৮৬ সালের মধ্যে নিম্নমাধ্যমিক স্তরে মোট ছাত্র সংখ্যার ২০% ও দশম শ্রেনীর মোট ছাত্র সংখ্যার ৫০% পুরো বা আংশিক সময়ের বৃত্তি বা কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

(খ) দক্ষ ও কুশলী কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি :

দক্ষ ও কুশলী কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ITI গুলিতে বৃত্তি শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। তাই এই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিতে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করার সুপারিশ করা হয়েছে।

(গ) পাঠত্যাগ কারীদের জন্য বৃত্তিশিক্ষা :

যারা আর্থিক বা অন্যান্য কারণে বিদ্যালয় থেকে পাঠত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে তাদের জন্য আংশিক বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

টিপ্পনী

(ঘ) মহিলাদের জন্য বৃত্তিশিক্ষা :

মহিলাদের যে সব বৃত্তিতে উৎসাহ আছে, সেই সব বিষয়ে ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্স পড়ানোর সুযোগ দেওয়া হবে।

৫. সামাজিক ও জাতীয় সংহতি স্থাপন

শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল সামাজিক ও জাতীয় সংহতি । এর জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গুলি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

(ক) কমন স্কুল :

জাতীয় লক্ষ্য হিসেবে সাধারণ শিক্ষার সমস্যা বিদ্যালয়কে কমন স্কুল বা সর্বজনীন বিদ্যালয়ে রূপ দিতে হবে এবং আগামী ২০ বছরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে একে বাস্তবায়িত করতে হবে। সর্বজনীন বিদ্যালয় শিক্ষা জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে সকলেই শিক্ষার সুযোগ পাবে।

(খ) সামাজিক ও জাতীয় সেবামূলক কাজ :

বিদ্যালয় ও কলেজে পাঠক্রমিক অধ্যায়নের পাশাপাশি প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ সামর্থ্য ও পরিবেশ অনুযায়ী ছাত্রদের মধ্যে সামাজিক জীবন গড়ে তোলার চেষ্টা করবে। বিদ্যালয় এবং কলেজের কাজ, হোস্টেলের ও খেলার মাঠের নানা কাজ শিক্ষার্থীদের দিয়েই করানো হবে।

৬. ভাষানীতি গঠন

(ক) মাতৃভাষা ও আঞ্চলিক ভাষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব :

বিদ্যালয় শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে এমনকি কলেজ শিক্ষার ক্ষেত্রেও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার দাবিকে অগ্রাধিকার দওয়া প্রয়োজন। আঞ্চলিক ভাষা গ্রহণ এবং তার উন্নয়ন করা প্রয়োজনে যাতে উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে এর ব্যবহার করা যায়।

টিপ্পনী

(খ) ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব :

সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গুলিতে ইংরেজি মাধ্যমই চালু থাকা উচিত। ইংরেজি ভাষা শিক্ষা শুরু হবে পঞ্চম শ্রেণি থেকে।

(গ) হিন্দি ভাষার গুরুত্ব :

যেহেতু হিন্দি রাষ্ট্রভাষা এবং অধিকাংশ জনগণের যোগাযোগের ভাষা তাই এই ভাষা প্রচারের জন্য সর্বতোভাবে সচেষ্ট হতে হবে। অহিন্দি ভাষাভাষী এলাকার হিন্দি ভাষা প্রসারের চেষ্ঠা করতে হবে।

৭. শিক্ষার আধুনিকীকরণ :

আধুনিক সমাজে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে জ্ঞান বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর জন্য প্রয়োজন হল শিক্ষাব্যস্থার মধ্যে পরিবর্তন আনা, শিক্ষা কেবলমাত্র জ্ঞানার্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কৌতুহল আগ্রহ দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের বিকাশ চিন্তন, বিচারকরণ স্বয়ং শিক্ষা ইত্যাদির উপর দক্ষতা অর্জনে শিক্ষাই হবে হাতিয়ার।

৮. জাতীয় চেতনা বৃদ্ধি :

(ক) ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করা :

শিক্ষার মধ্যে দিয়ে ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম, ইতিহাস, শিল্পসৃষ্টি, সংগীত, নৃত্য ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দিতে হবে।

(খ) ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মধ্যে আশার সঞ্চার করা :

ভারতের সংবিধানের মূল নীতি এবং মুখবন্ধে মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে যে উচ্চ আদর্শের কথা ব্যক্ত হয়েছে সে সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে।

৯. গণতন্ত্রের সাফল্যে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ :

(ক) সংবিধানের ৪৫ নং ধারা :

সংবিধানের ৪৫ নং ধারার নির্দেশ মতো ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সকলের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। জাতিধর্ম নির্বিশেষে অর্থনৈতিক ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করে সর্বস্তরে নেতৃত্ব গড়ে তোলার অনুকুল পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

(খ)উপযুক্ত পাঠক্রম প্রণয়ন :

বিদ্যালয়শিক্ষার কর্মসুচি ও পাঠক্রম এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে গতানুগতিক মুল্যবোধ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক মন ও দৃষ্টিভঙ্গি, ধর্ম, সহিষ্ণুতা,

সমাজসেবা, জনসাধারণের স্বার্থরক্ষা, আত্মবিশ্বাস প্রভৃতি গুণাবলির বিকাশ ঘটে।

১০. শিক্ষার কাঠামো নির্ধারণ ও মানোন্নয়ন :

শিক্ষার মান চারটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে -

(ক) সমগ্র শিক্ষা কাঠামোয় কটি স্তর এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক (খ) প্রতিটি স্তরের শিক্ষাকাল ও মোট শিক্ষাকাল (গ) শিক্ষার বিভিন্ন উপাদান এবং শিক্ষোপকরণ (ঘ) প্রাপ্ত সুযোগের সদব্যবহার।

টিপ্পনী

(ক) শিক্ষার কাঠামো :

শিক্ষা কমিশন নতুন শিক্ষাকাঠামো সুপারিশ করতে গিয়ে বলেছেন, নতুন শিক্ষার রূপ হবে -

(অ) ১ থেকে ৩ বছরের প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা (আ) ৭ বা ৮ বছরের প্রাথমিকশিক্ষা এবং ২ বা ৩ বছরের উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষা (ই) ২ বা ৩বছরের নিম্নমাধ্যমিক শিক্ষা (ঈ) ২ বছরের উচ্চমাধ্যমিকস্তরের সাধারন শিক্ষা অথবা ১ বছর থেকে ৩ বছরের বৃত্তিশিক্ষা (উ) উচ্চশিক্ষার স্তরে তিন বছরের অধিক শিক্ষা পেশ করার পর প্রথম ডিগ্রী দেওয়া হবে।

(খ) শিক্ষার উপাদান এবং উপকরণ :

শিক্ষার মান অনেকাংশে নির্ভর করে শিক্ষার উপাদান এবং অন্যান্য বিষয়ের ওপর যেমন - শিক্ষক, পাঠক্রম, শিক্ষা পদ্ধতি, মূল্যায়ন, চার্ট, মানচিত্র প্রভৃতি গতানুগতিক শিক্ষোপকরণের ব্যবহার ছাড়াও বেতার ও দূরদর্শনের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

১১. শিক্ষার দিন নির্ধারণ :

কমিশন বিদ্যালয় গুলিতে এবং কলেজ গুলিতে প্রতিবছর যথাক্রমে ২৩৪ দিন (৩৯ সপ্তাহ) ও ২১৬ দিন (৩৬ সপ্তাহ) করার সুপারিশ করেছে। দীর্ঘ অবকাশ ছাড়া অন্যান্য ছুটি কমিয়ে দিন দিনকরতে হবে। পরীক্ষার জন্য বিদ্যালয় ২১ দিনও কলেজ ২৭ দিন বরাদ্দ থাকবে।

১২. বিদ্যালয়গুচ্ছ গঠন :

(ক) সহযোগিতার মনোভাব তৈরি করা :

বিদ্যালয় গুলির মধ্যে বিচ্ছিন্ন মনোভাব দূর করা এবং সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলা।

টিপ্পনী

(খ) মূল্যায়নের সঠিক পদ্ধতি :

আলোচনার মাধ্যমে মূল্যায়নের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বিদ্যালয় গুলিতে তার প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বিদ্যালয় গুলিতে তার প্রয়োগ পদ্ধতি নিরুপণ করা।

(গ) শিক্ষকের মান :

অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকদের উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জনে সাহায্য করা।

(ঘ) বিদ্যালয়ের উন্নতিতে প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা

প্রতিটি বিদ্যালয়ে বার্ষিক শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনা তৈরির ক্ষেত্রে জোট অন্তর্ভুক্ত বিদ্যালয় গুলির প্রধান শিক্ষকগন আলোচনার মাধ্যমে করণীয় গুলি স্থির করবেন। তাঁরা একত্রে বিদ্যালয়ের উন্নতি বিধানে চিন্তাভাবনা করবেন।

১৩. শিক্ষার সমসুযোগ সৃষ্টি :

(ক) সমসুযোগের প্রয়োজন

শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া এবং বঞ্চিত সম্প্রদায় যাতে শিক্ষার সমসুযোগ পায় এবং শিক্ষার দ্বারা নিজের ও সমাজের উন্নয়নে অংশগ্রহণে সমর্থ হয়, সে ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন।

(খ) সমসুযোগের জন্য ব্যবস্থা :

কমিশন বলেছেন অর্থনৈতিক কারণে কোনো বিদ্যালয়গামী বয়সের শিশুরা যাতে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয় সেই উদ্দেশ্য এমনভাবে পরিকল্পনা ও কার্মসূচী নিতে হবে, যাতে দেশে সর্বস্তরেই শিক্ষা একদিন অবৈতনিক হবে।

১৪. নির্দেশনা ও পরামর্শ দান :

প্রতিটি শিক্ষার্থীর ব্যাক্তিগত বিশেষ করে শিক্ষা সংক্রান্ত কোনো সমস্যা সমাধানে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে অভিজ্ঞ ব্যাক্তির পরামর্শ বিশেষ প্রয়োজন, তাছাড়া ভবিষ্যতে শিক্ষা পরিকল্পনা এবং তদানুযায়ী পাঠক্রম নির্বাচন এবং তথ্যসংগ্রহে শিক্ষার্থী এবং তার অভিভাবককে সহযোগিতা করাও বিদ্যালয়ের নির্দেশনা ও পরামর্শ বিভাগের দায়িত্ব।

১৫. মূল্যায়নে নতুন কর্মসূচি গ্রহণ :

(ক) শিক্ষার সঙ্গে মূল্যায়নের সম্পর্কে :

কমিশন মনে করেন মূল্যায়ন একটি নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া এবং সামগ্রিক

শিক্ষাব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিক্ষার্থীর পাঠভ্যাস এবং শিক্ষকের পাঠদান পদ্ধতির ওপর মূল্যায়ন প্রভাব বিস্তার করে।

(খ) মূল্যায়নের কৌশলগুলির বৈশিষ্ট্য :

কৌশলগুলি অবশ্যই যথার্থ নির্ভরযোগ্য, নৈর্ব্যক্তিক এবং ব্যবহারোপযোগী হবে।

১৬. শিক্ষা পরিকল্পনা ও প্রশাসনিক বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান :

টিপ্পনী

(ক) জাতীয় শিক্ষানীতি প্রনয়ন

যদিও শিক্ষা হল রাজ্যের বিষয়। তবে একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রবর্তনের প্রয়োজন।

(খ) জাতীয় লক্ষ্য নির্বাচন :

শিক্ষার সর্বস্তরে গুণগত মান উন্নয়নের জন্য সামগ্রিকভাবে জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণ করা একান্ত প্রয়োজন।

(গ)সীমিত সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার ও শিক্ষার অপচয়রোধ :

দেশের সীমিত সম্পদের প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি অগ্রাধিকার দিতে হবে, পাশাপাশি শিক্ষার সর্বস্তরে গুণমান বৃদ্ধি করতে হবে।

(ঘ) বেসরকারি উদ্যোগের সহযোগিতা

শিক্ষার প্রসার ও পরিচালনার জন্য বেসরকারি উদ্যোগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা উচিত।

১৭. আর্থিক ব্যায় নির্ধারণ :

(ক) ১৯৬৫ - ৬৬ সালে ব্যায়

কমিশন মন্তব্য করেছে যে ১৯৬৫ - ৬৬ সালে শিক্ষার ব্যায় ৫ গুন বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৫০ - ৫১ সালে জন প্রতি ব্যায় ছিল ৩.২ টাকা এবং ১৯৬৫ - ৬৬ সালে এটা দাঁড়িয়েছে ১২.১ টাকা। ১৯৫০ - ৫১ সালে সমগ্র শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যায় হয়েছিল জাতীয় আয়ের ১.২ শতাংশ এবং ১৯৬৫ - ৬৬ সালে হয়েছে ২.৭ শতাংশ।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
133

(খ) ১৯৮৫ - ৮৬ সালে ব্যায় :

শিক্ষাকে যথাযথ ভাবে রূপ দিতে গেলে জনপ্রতি বর্তমানে (১৯৬৫) ১২.১ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১৯৮৫ - ৮৬ সালে এটা হবে ৫৪ টাকা। এর অর্থ হলো ১৯৬৫ - ৬৬ সালে শিক্ষার ক্ষেত্রে ৬.০০০ মিলিয়ন টাকা খরচ হয়েছিল এবং ১৯৮৫-৮৬ সালে

এটা বৃদ্ধি পেয়ে হবে ৪০,৩৫৪ মিলিয়ন টাকা। মোট জাতীয় সম্পদ এর বিচারে এর অনুপাত হবে ১৯৬৫-৬৬ সালে ২.৯ শতাংশ থেকে ১৯৮৫ - ৮৬ সালে ৬ শতাংশ।

C. শিক্ষা কমিশনের সমালোচনা

১. মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাকাঠামো সংক্রান্ত সমস্যা :

টিপ্পনী

কমিশন মাধ্যমিক স্তরে দ্বাদশ শ্রেণীর কথা বলেছে, যার ফলে শিক্ষাকাল একবছর বৃদ্ধি পাবে। ইতিমধ্যে যে সব বিদ্যালয় একাদশ শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে তার একটা অংশকে দ্বাদশ শ্রেণীতে নামিয়ে আনতে হবে। এর ফলে একাদশ শ্রেণীতে উন্নীত করতে যে অর্থ, শ্রম এবং সময় ব্যায় হয়েছিল তার অপচয় হবে।

২. শিক্ষার সমসুযোগের সমস্যা:

কমিশন গুরুত্ব সহকারে শিক্ষায় সম সুযোগের কথাটি উল্লেখ করেছে। কিন্তু সেখানে বেসরকারি উদ্যোগের উপর শিক্ষা অনেকাংশ নির্ভরশীল। শিক্ষাপ্রসারের নামে সেখানে বাণিজ্যকরণ শুরু হয়েছে। সেখানে কমিশনের বক্তব্য স্পষ্ট নয়।

৩ বাধ্যতামূলক সমাজ সেবার ব্যবস্থা:

কমিশন সর্বস্তরে সমাজসেবাকে বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সমাজসেবাকে বাধ্যতামূলক করা হলে সমাজসেবার আদর্শের ভুল ব্যাখ্যা হয়।

কোঠারি কমিশনের সুপারিশগুলির ভিত্তি করে ভারত সরকার ১৯৬৮ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি চালু করে। এই শিক্ষানীতিতে যে সমস্ত সুপারিশ গুলি বিবেচিত হয়নি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল -

(অ) শিক্ষার উন্নয়নে নতুন অগ্রাধিকার।

(আ) উচ্চমাধ্যমিক ওবিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ভরতির জন্য নিয়ন্ত্রিত নির্বাচন।

(ই) নির্বাচিত বিদ্যালয়ের উন্নয়ন।

(ঈ) বিশেষ ও প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়

(উ) বৈষম্যমূলক অনুদান ব্যবস্থা।

(ঊ) প্রশাসনগত সংস্কার এবং ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিস ইত্যাদি।

সাধারণ শিক্ষা :

যে শিক্ষার মাধ্যম ব্যাক্তির চারিত্রিক, নৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক,

নান্দনিক ইত্যাদি সমস্ত দিকের সুষম বিকাশ ঘটে, তাকেই সাধারণ শিক্ষা বা সাধারণধর্মী শিক্ষা বলা হয়।

প্রাকপ্রাথমিক শিক্ষা :

প্রথাগত প্রাথমিক শিক্ষার পূর্বে যে শিক্ষা, তাকে বলা হয় প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা।

টিপ্পনী

১. প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

(ক) শিশুদের মধ্যে স্বাস্থ্যকর অভ্যাস, গড়ে তোলা এবং বিক্তগত অভিযোজনের জন্য, যেমন - পোশাক, পরিধান, টয়লেটের অভ্যাস ইত্যাদির জন্য মৌলিক দক্ষতা গড়ে তোলা।

(খ) প্রয়োজনীয় সামাজিক অভ্যাস ও আদবকায়দা গড়ে তোলা দলগত কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহ দান করা এবং অন্যদের অধিকারও সুযোগ সুবিধার প্রতি অনুভূতিশীল করে তোলা।

(গ) শিশুকে তার অনুভূতি, আবেগ বুঝতে প্রকাশ ওনিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করা।

(ঘ) শিশুর নান্দনিক বোধকে উৎসাহিত করা।

২. প্রাকপ্রাথমিক শিক্ষার স্তরের কাঠামো :

এই স্তরের শিক্ষাকাল হবে ১- ৩বছর। শিশুরা ৩ বা ৪ বছর বয়সে পৌঁছলে এই স্তরে পাঠ গ্রহনের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। এই পাঠ চলবে তাদের ৫ - ৬ বছর বয়স পর্যন্ত।

৩. প্রাকপ্রাথমিক শিক্ষাস্তরের পাঠক্রম :

কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ পর্ষদ নিয়োজিত কমিটির সঙ্গে একমত হয়ে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি হল -

(ক) খেলাধূলার মাধ্যমে শিক্ষাদান এর মধ্যে রয়েছে খেলনা, বিভিন্ন Indoor এবং Outdoar খেলা সেখানে সব শিশুকে মুক্তভাবে খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

(খ) শারীরিক ক্রিয়াকলাপ।

(গ) শারীরশিক্ষা - যার মধ্যে রয়েছে সাধারণ ব্যায়াম, নাচ ইত্যাদি।

(ঘ) মানসিক শিক্ষা যার মধ্যে রয়েছে বাগান তৈরি, বিভিন্ন সামাজিক সহজ

কাজে অংশগ্রহণ।

৪. ভারতে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান

ভারতে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গুলি বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন - (ক) ক্রেস (খ) নার্সারিবিদ্যালয় (গ) কিন্ডারগার্টেন বিদ্যালয় (ঘ) মন্তেসরি বিদ্যালয় (ঙ) প্রাক্‌বুনিয়াদি বিদ্যালয় (চ) বাল শিক্ষামন্দির।

টিপ্পনী

৫. প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

কমিশন বিভিন্ন কারণে প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপকরেছে। কারণ গুলির মধ্যে অন্যতম হল -

(ক) বাবা মায়ের অনুপস্থিতি জনিত ঘাটতি পূরণ করা

বর্তমানে আর্থসামাজিক কারণে অনেক শিশুর বাবা, মা উভয়েই চাকুরিরত। ফলে শিশুর সুষ্ঠু বিকাশের জন্য তাঁরা প্রয়োজনীয় সময় দিতে পারেন না। প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই ঘাটতি পূরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

(খ) শিশুর সুষ্ঠু বিকাশে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম পরিসরের ব্যবস্থা করা :

দরিদ্র পরিবারের বাসস্থান, বিশেষ করে শহরাঞ্চল এতেই ক্ষুদ্র যে, সেখানে শিশুর সুষ্ঠ বিকাশের জন্য ন্যূনতম পরিসরের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই সমস্যার সমাধানে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৬. প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ

কমিশনের প্রধান সুপারিশ গুলি হল -

(ক) উপযুক্ত বয়সের শিশুদের প্রাক্‌প্রাথমিক শিক্ষার আওতাভুক্ত করা :

৩-৫ বছরের ছেলে মেয়েদের ৫% ও ৫-৬ বছরের ছেলেমেয়েদের ১৫% যাতে ১৯৮৬ সালের মধ্যে এই শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় আসে সে চেষ্টা করতে হবে।

(খ) রাজ্যভিত্তিক কেন্দ্রীয় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাপন :

প্রতিটি রাজ্যে প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাপন করা হবে।

(গ) জেলাভিত্তিক প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কেন্দ্র স্থাপন :

প্রতিটী জেলায় প্রাকপ্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা, পরিদর্শন ও প্রসারের জন্য একটি করে কেন্দ্র স্থাপিত হবে। এছাড়া এখানে এই স্তরের শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ গবেষণা প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং পুস্তক রচনার ব্যবস্থা করা হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা

শিক্ষার কাঠামোর প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেনী প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত । বর্তমানে এতে প্রারম্ভিক শিক্ষা বলা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য

টিপ্পনী

(ক) শিশুর মধ্যে পরিবেশ সম্পর্কিত বিষয়ে কৌতূহলী করে তোলা।

(খ) ন্যায়, অন্যায়, ভালো মন্দ পাপ- পুণ্য ইত্যাদির সঠিক বিচারের জন্য নিতীবোধ গড়ে তোললা।

(গ) শিশুর মধ্যে পরিচ্ছন্ন চিন্তার বিকাশ ঘটানো। শিশুকে সঠিক ও স্পষ্ট লিখতে ও উচ্চারণ করতে সক্ষম করে তোলা।

প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম

কমিশন প্রাথমিক শিক্ষাকে ২টি স্তরে বিভক্ত করেছে। স্তর গুলি হলো - (১) নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষা স্তর (২) উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষা স্তর।

১. নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষাস্তর

কমিশন নিম্ন প্রাথমিক স্তরের পাঠক্রমে নীচের বিষয়গুলি উল্লেখ করেছে -

(অ) ভাষা : মাতৃভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষা।

(আ) গণিত : গণিতের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। ভাষা ও গণিতকে শিখনের মৌলিক দক্ষতা বিচার করতে হবে।

(ই) পরিবেশ সম্বন্ধে ধারণা : IIIএবং IV এর ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান পাঠের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

(ঈ) সৃজণশীল কাজ : শিশুদের সৃষ্টিশীলতা প্রকাশের জন্য সংগীত, কলা, নাটক ও বিভিন্ন হাতের কাজ করাতে হবে।

(উ) কর্মশিক্ষা ও সমাজসেবা : কাগজ কাটা, কার্ডবোর্ড কাটা, মাটি বা প্লাস্টিকদিয়ে মডেল তৈরি, সুতো কাটার কাজ, রান্নার কাজ ইত্যাদি পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হবে।

(ঊ) স্বাস্থ্যশিক্ষা : এই স্তরে শিশুদের ভালো স্বাস্থ্যাভ্যাস গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা দেওয়া দরকার।

টিপ্পনী

২. উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষাস্তর (V - VII or VIII)

উচ্চ প্রাথমিক স্তরের পাঠক্রমে কমিশনের সুপারিশগুলি হল -

(ক) আবশ্যিক ২টি ভাষা :

(অ) মাতৃভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষা।

(আ) হিন্দি অথবা ইংরেজি।

(খ) গনিত :

গণিতের মধ্যে পাটিগনিত, বীজগণিত, জ্যামিতি পড়তে হবে। বিভিন্ন সূত্র, গাণিতিক নীতি, যুক্তমূলক চিন্তনের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

(গ) বিজ্ঞান :

V শ্রেণীর পাঠ্যসূচীতে থাকবে - পদার্থ বিদ্যা, ভূবিদ্যা, জীবনবিজ্ঞান ।VI শ্রেণীর পাঠ্যসূচিতে থাকবে - পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীবনবিজ্ঞান । VII শ্রেণীর পাঠ্যসূচিতে থাকবে - পদার্থবিদ্যা, জীবনবিজ্ঞান, রসায়ন, জ্যোর্তিবিদ্যা।

(ঘ) সমাজবিজ্ঞান :

পাঠক্রমে থাকবে ইতিহাস, ভূগোল ও পৌরবিজ্ঞান।

(ঙ) চারুকলা :

পাঠক্রমে থাকবে অঙ্কণ, চিত্রকলা, ভাস্কর্য প্রভৃতি।

(চ) কর্মশিক্ষাও সমাজসেবা :

কৃষি খামার ও অন্য উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। বাঁশের কাজ, চামড়ার কাজ, মাটির কাজ, ছুঁচের কাজ ইত্যাদি।

(ছ) শারীরশিক্ষা :

এই স্তরে প্রথমদিকে ছেলে ও মেয়েদের বিভিন্ন শারীরশিক্ষা ব্যবস্থা থাকবে। তবে মেয়েদের ক্ষেত্রে কম পরিশ্রম যুক্ত খেলা যেমন ব্যডমিন্টন, থ্রো বল ইত্যাদি খেলার ব্যবস্থা রাখা দরকার।

(জ) নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা :

সপ্তাহে একটি অথবা দুটি পিরিয়ড় এই বিষয়ের শিক্ষার জন্য রাখতে হবে। প্রাথমিক স্তরে বিভিন্ন নীতিগল্প, বিধেয়, বিভিন্ন ধর্মের নীতি শিক্ষা দিতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ

(ক) অনুন্নয়ন ও অপচয় এমন ভাবে কমিয়ে আনতে হবে যাতে বিদ্যালয়ে যারা ভরতি হয় তাদের শতকরা ৮০জন শিশু সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পৌঁছতে পারে।

(খ) যে সব ছেলে মেয়ে বয়স ১১ - ১৪ বছরের মধ্যে, তারা যদি কোনো কারণে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা শেষ করতে না পারে, তাহলে তাদের জন্য কমপক্ষে এক বছরের সাক্ষরতা শিবিরের ব্যবস্থা করতে হবে।

টিপ্পনী

(গ) প্রথম শ্রেণিতে অপচয় রোধ করার জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিকে একটি ইউনিট হিসেবে গণ্য করা হবে।

(ঘ) নারীশিক্ষার দিকে কমিশন বিশেষ দৃষ্টি দিতে বলেছে । তাদের জ্য সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্পর্কেও নজর রাখতে হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা

সাধারণত মাধ্যমিক শিক্ষা বলতে বোঝায় নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষা।

মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য

(ক) গণতান্ত্রিক নাগরিক তৈরি করার উদ্দেশ্যে শক্তিশালী সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করা। যার উপর নির্ভর করে শিক্ষার্থী কর্মজীবন কিংবা উচ্চতর সাধারণ শিক্ষায় বা নানাবিধ বৃত্তি ও কারিগরিক শিক্ষায় প্রবেশ করতে পারে।

(খ) সাহিত্য, কলা, শিল্প ও সাংস্কৃতিক দিকের প্রতি শিক্ষার্থীদের উৎসাহ সৃষ্টি করা।

(গ) শিক্ষার্থীরা যাতে সার্থকভাবে সামাজিক অভিযোজনে সক্ষম হয় সে ব্যাপারে তাদের সাহায্য করা।

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের পাঠক্রম

(ক) ভাষা - ৩টিভাষা আবশ্যিক, মাতৃভাষা, হিন্দি, ইংরেজি।

(খ) গণিত - পাটিগণিত, জ্যামিতি, বীজগণিত, রাশিবিজ্ঞান ইতভাদি বিভাগ আছে।

(গ) বিজ্ঞান - পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, জীবনবিজ্ঞান ও ভু-বিজ্ঞান আবশ্যিক হিসেবে পাঠ্যক্রমে অর্ন্তভুক্ত হবে।

(ঘ) সমাজ বিজ্ঞান - ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান।

(ঙ) চারুকলা বা হস্তশিল্প - চিত্রকলা, অঙ্কন, ভাস্কর্য প্রভৃতি বিষয়।

(চ) কর্মশিক্ষা ও সমাজসেবা - কাঠের কাজ, ধাতুর কাজ, চামড়ার কাজ, সাবান তৈরি, সেলাই দর্জির কাজ প্রভৃতি।

মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

টিপ্পনী

মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ৫টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

(১) শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব গ্রহণ ভিত্তিক (২) লিঙ্গভিত্তিক (৩) সময়কাল ভিত্তিক (৪) মাধ্যম ভিত্তিক (৫) অন্যান্য বিষয় ভিত্তিক।

মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ

মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার :

(১) আগামী ২০ বছরের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণকারী ছাত্রসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য (ক) মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির অবস্থান সম্পর্কে উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ। (খ) শিক্ষার মান উন্নয়নের ব্যবস্থা এবং (গ) যোগ্যতম শিক্ষার্থী নির্বাচন করা একান্ত প্রয়োজন।

(২) বহিস্থ পরীক্ষার ফলাফল ও বিদ্যালয়ের রেকর্ডের ভিত্তিতে যাতে যোগ্যতম শিক্ষার্থিকে মাধ্যমিক স্তরে ভরতি করা যায় তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

মাধ্যমিক শিক্ষার বৃত্তিমুখী করণ:

(১) নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে ২০% এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ৫০% ছাত্র যাতে ১৯৮৬ মধ্যে বৃত্তি শিক্ষার সুযোগ পায় সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) গ্রাম ও শহরের ছেলে মেয়ে উভয়ের প্রয়োজন মেটাবার উপযোগী নানা ধরণের আংশিক সময় ও পুরো সময়ের বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

স্ত্রী শিক্ষার প্রসার :

(১) আগামী ২০ বছরের মধ্যে বালিকা ও বালকদের অনুমতি নিম্নমাধ্যমিক স্তরে ১ : ২ ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ১ : ৩ করতে হবে।

(২) অধিক সংখ্যক ছাত্রীকে শিক্ষায় আগ্রহী করে তোলার জন্য বৃত্তি বা স্কলারশিপের ব্যবস্থা করতে হবে।

মাধ্যমিক স্তরে ভাষা শিক্ষা :

নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে (নবম ও দশম শ্রেণী) তিনটি ভাগে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। যথা মাতৃভাষা, রাষ্ট্র ভাষা, সহযোগী ভাষা (ইংরেজি)।

অন্যান্য সুপারিশ :

(১) নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। বাধ্যতামূলকভাবে সমাজ সেবাকেও গ্রহণ করতে হবে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিশেষীকরণের সুযোগ থাকবে এবং এজন্য এই স্তরে বিজ্ঞান ও গণিতআবশ্যিক হবে না।

(২)কমিশন সুপারিশ করে দশমশ্রেণীর পাঠ শেষ হলে প্রথম বহির্বিভাগীয় পরিক্ষা গ্রহণ করতে হবেএবং দ্বাদশ শ্রেণীর শেষে দ্বিতীয় বহির্বিভাগীয় পরিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা (১২ স্তর)

বিদ্যালয়ে দশ বছরের শিক্ষা শেষ হবার পর শিক্ষার্থীর আগ্রহও সামর্থ্য অনুযায়ী দুই বছরের শিক্ষা গ্রহণ করে এটিই হল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাস্তর।

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য

(ক) নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষাকে দৃঢ়তর করা, প্রসারিত করা এবং সেই সঙ্গে বিষয় নির্বাচনের সুযোগ করে বিশেষীকরণ মুখীনতা করা কিন্তু চরম বিশেষীকরণ নয়।

(খ) এই স্তরে৫০% শিক্ষার্থীর আংশিক সময়ের জন্য বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। বাকি ৫০% এর জন্য থাকবে সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা, বাণিজ্য, কৃষি ও কারিগরি বিদ্যা বৃত্তি শিক্ষার মধ্যে গণ্য করা হবে।

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো

এটি দুটি ভাগে বিভক্ত - নিম্ন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাদুটি বছরের একাদশ শ্রেণী এবং দ্বাদশ শ্রেণী। বয়স হবে যথাক্রমে ১৬+ এবং ১৭ বছর।

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রম

(ক) ভাষা - যে কোন দুটি ভাষা এই দুটি ভাষার মধ্যে থাকবে যে কোনো একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা, আধুনিক বিদেশি ভাষা এবং প্রাচীন ভাষা।

(খ) নিচের মধ্যে থেকে যে কোন তিনটি Elective বিষয় হিসেবে বেছে

টিপ্পনী

নিতে হবে একটি অতিরিক্ত ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, তর্কবিদ্যা, মানবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, চারুকলা, অর্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত, জীবনবিজ্ঞান, ভূ-তত্ত্ব, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান।

(গ) কর্মশিক্ষা ও সমাজ সেবা।

(ঘ) শারীরশিক্ষা।

টিপ্পনী

(ঙ) চারুকলা বা হস্তশিল্প।

(চ) নৈতিক বা আধ্যাত্মিক শিক্ষা।

পাঠক্রম সম্পর্কে কমিশনের বিশেষ বক্তব্য

এই পাঠক্রম স্থির করবে বিদ্যালয় প্রাদেশিক সরকারের স্কুলশিক্ষা, বোর্ডগুলি, প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষা ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধিদের তৈরি একটি এক্সপার্ট বডি।

অ্যাডভান্স কোর্স সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ

প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষা ডিপার্টমেন্টে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের বিষয়গুলি নিয়ে অ্যাডভান্স কোসর্স চালু করতেপারে। প্রথমে কয়েকটি উত্তর বিদ্যালয়ে এই ধরণের অ্যাডভান্স কোসর্স চালু করা যেতে পারে।

(ক) সপ্তম শ্রেণী থেকে এটা চালু হবে। তবে এটি ছাত্রদের ঐচ্ছিক হিসেবে গণ্য হবে।

(খ) নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে গণিত, বিজ্ঞান ও ভাষার উপর অ্যাডভান্স কোর্স চালু করা যেতে পারে।

(গ) তবে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে এই অ্যাডভান্স কোর্সে প্রতিটি বিশেষ বিষয়ের জন্য করা দরকার। তবে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শেষের ক্ষেত্রে ২ এর বেশি বিষয়ে অ্যাডভান্স কোর্স এর ব্যবস্থা থাকবে না।

শিক্ষার্থীরা ২ বছরের উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাসমাপ্ত করার পর নিজস্ব আগ্রহ ও সামর্থ্য অনুযায়ী উচ্চশিক্ষার দিকে অগ্রসর হয়।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য

কমিশন উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত লক্ষ্যগুলি স্থির করেন।

(ক) উন্নত জ্ঞানের সন্ধান দৃঢ় ও নির্ভীকভাবে সত্যের সন্ধানে নিয়োজিত থাকা এবং প্রাচীনকালে জ্ঞান ও বিদ্যার্জন নতুন আবিষ্কারের আলোকে ব্যখ্যা করা।

(খ) জাতীয় চেতনার উদবুদ্ধ করা।

(গ) উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়ন।

উচ্চশিক্ষার কাঠামো

উচ্চ শিক্ষার স্তর হবে ৩ ধরনের -

(ক) প্রথম ডিগ্রী স্তর। (স্নাতক স্তর)

(খ) দ্বিতীয় ডিগ্রী স্তর। (স্নাতক স্তর)

(গ) গবেষণা স্তর।

উচ্চশিক্ষার সুপারিশ

(ক) সময়কাল - প্রথম ডিগ্রী স্তর ৩ বছরের কম হবে না। দ্বিতীয় ডিগ্রী স্তর স্থিতিকাল হবে ২ বা ৩ বছর।

(খ)ভাষাশিক্ষা - ভাষা শিক্ষা সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ গুলি হল -

(১) উচ্চ শিক্ষার স্তরের কোনো ক্ষেত্রে ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক নয় ।

(২) বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ধীরে ধীরেআঞ্চলিক ভাষায় পড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) পাঠক্রমের পুনর্নবীকরণ- মাস্টার্স ডিগ্রী স্তরে পাঠক্রমের পুনর্নবীকরন প্রয়োজন। পাঠক্রম হওয়া উচিত 'জেনেরাল বেসড্'।

(ঘ) বিষয় নির্বাচনে শিথিলতা - প্রথম ডিগ্রী স্তরে কলা, বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞান কোর্সে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রয়োজন।

অনুশীলনী

১। মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো ও পাঠ্যক্রম বিষয়ে কোঠারী কমিশন যে সুপারিশ করে, সে বিষয়ে পর্যালোচনা কর।

২ । মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কোঠারী কমিশনের (১৯৬৪ - ৬৬) উল্লেখযোগ্য সুপারিশগুলি আলোচনা কর।

৩। মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রম বিষয়ে কোঠারী কমিশনের সুপারিশ আলোচনা কর।

৪। কোঠারী কমিশনের প্রস্তাবিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম উল্লেখ কর।

টিপ্পনী